# বিজ্ঞানের সহজ পাঠ

সাদিক-উর-রহমান

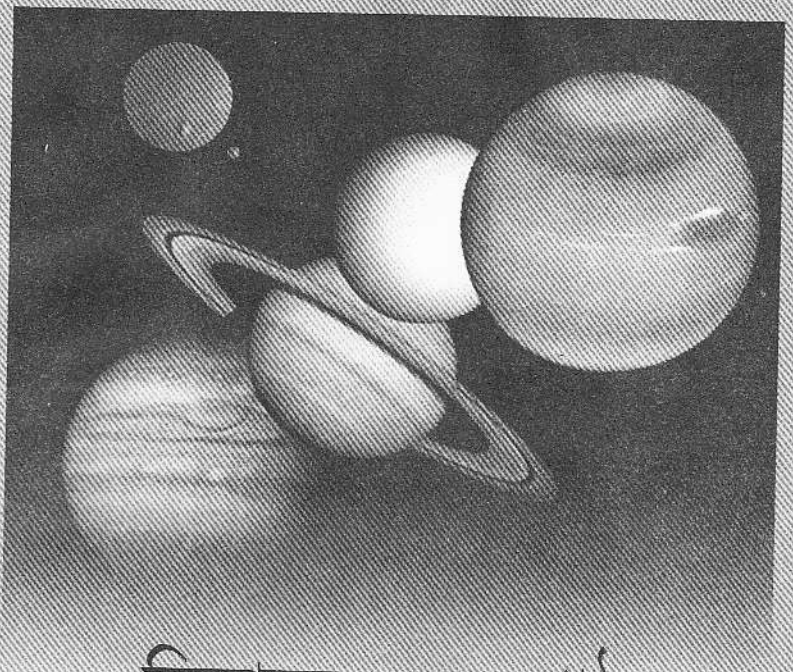

# বিজ্ঞানের সহজ পাঠ

সাদিক-উর-রহমান

অন্তর্ভুক্তি নং
SEQAEP

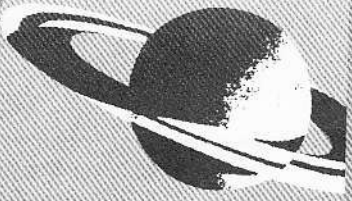



উপমা প্রকাশ

বিজ্ঞানের সহজ পাঠ
সাদিক-উর-রহমান

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

নতুন সংস্করণ : একুশে বইমেলা ২০১২
প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৯

উপমা প্রকাশ-১০

প্রকাশক
উপমা প্রকাশ
৪০/৪১, পি.কে. রায় রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
অংকুর

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস-ঢাকা

মূল্য : ৭০.০০

Biggyaner Shohoj Path
by Sadik-ur-Rahman
New Edition : Book Fair 2012, by Upoma Prokash
40/41, P.K. Roy Road, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 70.00

ISBN : 984-70160-0010-2

## সূচি পাতা


পৃথিবী-৫
সূর্য, পৃথিবী ও গ্রহ-৬
সূর্য ও তারা-৭
তারা-৮
সূর্যের আকার ও বয়স-৯
পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-১০
সূর্য ও তার নয়টি গ্রহ-১১
বড় গ্রহ ছোট গ্রহ-১২
সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্ব-১৩
সূর্যের অন্যান্য গ্রহ-১৪
শনি গ্রহের বলয়-১৫
নয়টি গ্রহে কি আছে?-১৬
পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ-১৭
সৌরজগৎ-১৮
বার্ষিক গতি ও আহ্নিক গতি-১৯
পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-২০
দিন ও রাত-২১
সূর্য ও গ্রহাণু-২২
উল্কা-২৩
ধূমকেতু-২৪
তারকামণ্ডল ও সপ্তর্ষিমণ্ডল-২৫
কালপুরুষ ও ক্যাসিওপিয়া-২৬
লুব্ধক ও ছায়াপথ-২৭
ধ্রুবতারা-২৮
চাঁদ গ্রহ উপগ্রহ-২৯
পৃথিবী ও চাঁদ-৩১
অমাবস্যা ও পূর্ণিমা-৩২
চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ-৩৩
উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ-৩৪
বিষুবরেখা মূল মধ্যরেখা-৩৫
দিন ও রাত-৩৬
শীত ও গরম-৩৮
পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল-৩৯
মহাকর্ষ-৪০
জোয়ার-ভাটা-৪১
ওজন ও মাধ্যাকর্ষণ-৪৪
চাঁদে মানুষের ওজন-৪৫
পদার্থ-৪৬
প্রাণী ও উদ্ভিদ-৪৭
আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়-৫০
মানব দেহ একটা গাড়ির ইঞ্জিন-৫১
ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড-৫২
জ্বর ও থার্মোমিটার-৫৩
অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড-৫৪
গাছ বা উদ্ভিদ-৫৫
বৃক্ষরোপণ-৫৬
বৃক্ষ ও আমাদের পরিবেশ-৫৭
পরিবেশ দূষণ-৫৮
শব্দ দূষণ-৫৯
বাতাস-৬০
বায়ুকল ও পানিচক্র-৬২
ফুটবলা খেলতে কোন্ বল
বা শক্তি প্রয়োজন?-৬৩
আগুন যেভাবে জ্বলে-৬৪
ঝড় ও বৃষ্টি-৬৫
মেঘ ও বৃষ্টি-৬৬
সূর্যের আলো ও রংধনু-৬৭
পানি তাপ জলীয় বাষ্প-৬৮
বাতাস, জলীয় বাষ্প,
কুয়াশা ও শিশির-৬৯
রেললাইনের জোড়ার মুখে
ফাঁকা রাখা হয় কেন-৭০
ঘোড়াগাড়ির চাকায় লোহার
বেড় পরানো হয় কেন-৭১
ভূমিকম্প-৭২
মাটি-৭৩
পাথর-৭৫
পানি-৭৬
সুস্থ থাকার জন্য কী করা উচিত?-৭৭
মশা ও ম্যালেরিয়া-৭৮
ঔষধী গাছ-৭৯
চেনা পাখি জানা পাখি-৮০

# পৃথিবী

আমরা আমাদের প্রিয় যে ভূমণ্ডলে বাস করি তার নাম পৃথিবী। মাটি, বালি ও পাথর মেশানো এই পৃথিবীর বুকে আছে সাগর, নদী, পাহাড়, গাছপালা। আরও আছে জীবজন্তু, মাছ, সরীসৃপসহ নানা ধরনের জলজ ও স্থলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ। এছাড়া আমাদের নিজের হাতে গড়া ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট–আরও কত কি! পৃথিবী কিন্তু আমাদের মায়ের মতো। এই পৃথিবীর বুকে আমরা জন্মাই, এর মাটিতেই আমরা ধুলোবালি মেখে খেলা করি আর ছোট থেকে বড় হয়ে উঠি। পৃথিবী আমাদের অক্সিজেন ও খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে।

বিজ্ঞানের ভাষায় পৃথিবী হলো একটা গ্রহ। ইংরেজিতে গ্রহকে বলে প্ল্যানেট (Planet)। গ্রহ হিসেবে পৃথিবী একা নয়। মহাকাশে পৃথিবীর সঙ্গী আরও গ্রহ আছে।

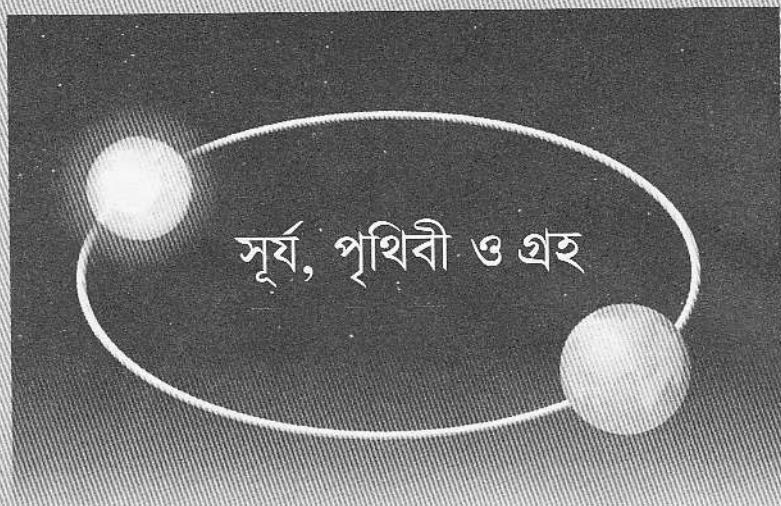


## পৃথিবী কেন গ্রহ (Planet)?

ছোটবেলায় আমরা যেমন মায়ের আদর আর ভালোবাসার বাঁধনে মায়ের চারপাশে ঘুরে বেড়াই, গ্রহরাও তেমনি সূর্যের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তবে সে ঘুরে বেড়ানোর একটা নিয়ম আছে। একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায় বলে পৃথিবীকে গ্রহ বলে। এই সূর্যই মায়ের স্নেহের মতো পৃথিবীকে আলো দেয়, তাপ জোগায়। তা না হলে আমাদের এই গ্রহটি থাকতো শীতল, তাতে আলো-বাতাস থাকতো না। আর আলো-বাতাস না থাকলে প্রাণের অস্তিত্বও থাকতো না। আমরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারতাম না।

## সূর্য কী?

পৃথিবী যে একটি গোলাকার উত্তপ্ত কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় তাকে আমরা সূর্য বলি। সূর্যকে ইংরেজিতে বলে Sun। রোজ সকালে সে পুব আকাশে ওঠে আর সন্ধেবেলা পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। সূর্য যে আলো দেয়, তাপ ছড়ায় তা খুব বোঝা যায়। সূর্য উঠলে ভোর হয়, দিনের আলো ফুটে ওঠে। দুপুরবেলায় সূর্যের তাপটাও বেশ বোঝা যায়। মাথার উপরে সূর্য জ্বলজ্বল করছে। কী গরম! আর দিনের শেষে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে চারদিকে নেমে আসে অন্ধকার।

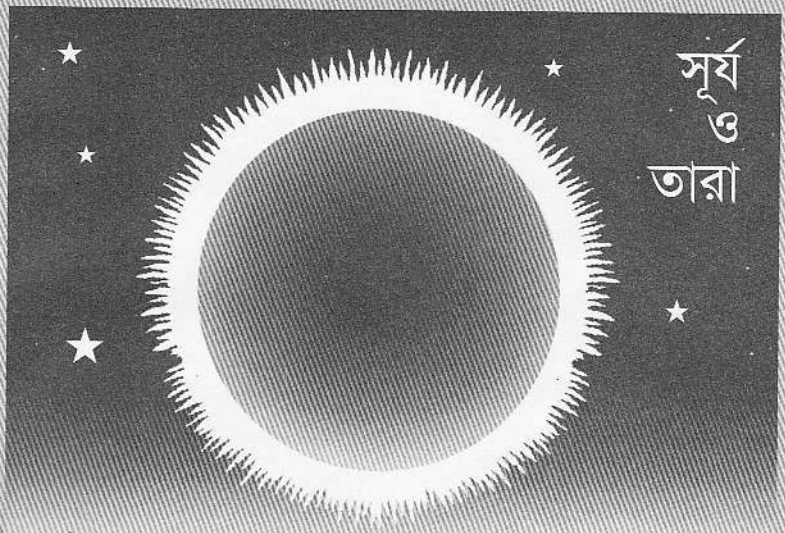


## সূর্যের আলো গরম, কিন্তু কত গরম?

চুলোয় যখন খাবার পানি ফোটানো হয় তখন পাতিলের গায়ে হাত দেয়া যায় না। কারণ পাতিলটা গরম হয়ে যায়। আর সূর্য! সে কত দূরে আছে, তবুও গরমের দিনগুলিতে দুপুর রোদে দাঁড়ানো যায় না? তাহলে সূর্য নিশ্চয়ই অনেক বেশি গরম? কিন্তু সূর্য কতটা গরম? ওজন যেমন আমরা মাপি গ্রামে, কিলোগ্রামে, জিনিসের দাম হিসেব করি টাকা-পয়সায়, কতটা পথ যাব যেমন তার হিসেব রাখা হয় কিলোমিটারে, তেমনি গরমের মাপ-জোখ করা হয় সেলসিয়াসে। গোলাকার সূর্যের কেন্দ্রের উত্তাপ হবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আমাদের মাথার উপরে অনেক কম, ৬০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো তাপমাত্রা পড়ে। কিন্তু সে গরমটাও চিন্তা করতে মাঝে মাঝে ভয় হয়। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। কিন্তু এত দূরে হওয়া সত্ত্বেও গরমের দিনে সূর্যের তেজে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

## তারারা আলো পায় কোথা থেকে?

আমরা রাতের আকাশে যে তারা জ্বলজ্বল করতে দেখতে পাই, সে আলো আসে তারাদের দেহের ভেতর থেকে। তারাগুলো নিজেদের দেহের ভেতরেই শক্তি গড়ে তোলে। সেই শক্তি থেকে আলো আসে, তাপ পাওয়া যায়। এইভাবে আলো আর তাপ দিতে দিতে এক একটা তারা একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন সে নিষ্প্রাণ, মৃত।

# তারা

## আকাশে তারারা মিটমিট করে জ্বলে কেন?

অনেক দূর থেকে তারারা আমাদের আলো পাঠায়। নানা পথ পার হয়ে আলো যখন এসে পৌঁছায় তখন পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বায়ুমণ্ডলের উপরে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। সমস্ত বায়ুমণ্ডল যেন বাতাসের এক একটা স্তর দিয়ে তৈরি। এই স্তর সমান ঘন নয়। পৃথিবীর কাছাকাছি যে বায়ুস্তর আছে, তার তুলনায় একটু বেশি ঘন। কোনো নির্দিষ্ট স্তরের ভেতর দিয়ে আলো সোজা পথেই চলবে। কিন্তু এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ঢোকার সময় সোজা পথ থেকে আলো একটু সরে যায়। তার ফলে আলোতে তখন কাঁপন লাগে। তাই, তারাদের আলো আমরা মিটমিট করে জ্বলতে দেখি।

## গ্রহরা কি মিটমিট করে জ্বলে না? তাদের আলো কি স্থির?

তারাদের তুলনায় গ্রহগুলো আছে আমাদের অনেক কাছে। সেই জন্যে তাদের যে আলো আমরা দেখতে পাই, তারাদের আলো থেকে তা অনেক উজ্জ্বল। এই গ্রহদের আলো যখন পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, তখন ঠিক তা তারার আলোর মতোই বায়ুমণ্ডলের এক একটা স্তর পার হয়ে আসে। আর এই পার হওয়ার সময় তারার আলোর মতোই সোজা পথ থেকে একটু সরে যায়। কিন্তু গ্রহের আলো এত উজ্জ্বল যে এই সরে যাওয়ার জন্যে আলোকরশ্মিতে যে কাঁপন লাগে তা বোঝা যায় না। সেজন্য গ্রহদের আলো মনে হয় স্থির।

## আকাশে কত তারা আছে?

আকাশের দিকে তাকালে অসংখ্য, অগুণতি তারা দেখা যায়। খালি চোখে ৫০০০ এর মতো তারা দেখা যায়। আর দূরবীন দিয়ে দেখলে এক এক রাতে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার তারা দেখতে পাওয়া যায়।

# সূর্যের আকার ও বয়স

## সূর্য কি সবচেয়ে বড়?

তারাদের মধ্যে সূর্যকে সবচেয়ে বড় দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, সূর্য সব তারকার চেয়ে বড়। আসলে কিন্তু তা নয়। সূর্য একটা মাঝারি ধরনের তারকা। পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের ব্যাস ১০৯ গুণের মতো বড়। তাহলে একটা সূর্যের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ পৃথিবীর জায়গা হয়ে যাবে। তবে সূর্যের চেয়েও অনেক বড় তারকা আছে। কিন্তু সূর্যের মতো আর তো কাউকে তত বড় দেখতে পাই না। সূর্য আমাদের পৃথিবীর খুব কাছে বলে সূর্যকে অত বড় দেখায়।

## সূর্য কি সবচেয়ে কাছের?

সূর্য আমাদের সবচেয়ে কাছের। সূর্য থেকে আমাদের দূরত্ব মোটামুটি ১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৭ হাজার কিলোমিটার। কাছের তারারাই যদি এত দূরে থাকে, তাহলে দূরের তারারা আরও অনেক দূরে থাকে। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় ৮ মিনিট।

## সূর্যের বয়স কত?

সূর্যের ছবি দেখে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সূর্যের বয়স হল প্রায় ৫০০ কোটি বছর। আর কতদিন সে বাঁচবে? যদি সে আরও ৫০০ কোটি বছর বাঁচে, তাহলে সে তার জীবনের অর্ধেক পার হয়ে এসেছে। কিন্তু সূর্য এখনও ১০০০ কোটি বছরের বেশি বেঁচে থাকবে। এই ৫০০ কোটি বয়সের সূর্যের চারপাশে আমাদের পৃথিবী সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

# পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ

## অন্য গ্রহ থেকে কি পৃথিবী দেখা যায়?

গ্রহদের নিজেদের কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোই এরা আলোকিত হয়। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, শনির যে উজ্জ্বল আলো দেখা যায়, সূর্যের আলোই তার কারণ। তেমনি সূর্যের আলোতে আমাদের পৃথিবীকেও উজ্জ্বল মনে হয়। কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না। কিন্তু যারা মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন, তারা মহাকাশের বুক থেকেই দেখেছেন, পৃথিবী উজ্জ্বল, আকারে বড়, চাঁদের মতোই সে সুন্দর।

## দিনে তারাদের মিটমিট করে জ্বলতে দখি না কেন?

আমাদের মনে হতে পারে, তারারা রাতের বেলা আলো দিয়ে দিনে বিশ্রাম করতে যায়। কিন্তু তা নয়। তারারা দিনের বেলাতে আলো দেয় রাতের বেলাতেও। তারাদের চোখে ঘুম নেই। দিনের বেলা সূর্যের উজ্জ্বল আলো তারাদের লুকিয়ে রাখে।

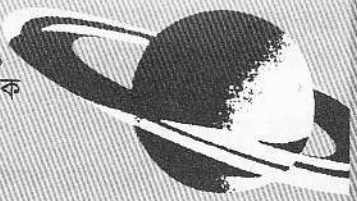

গ্রহদের আমরা দিনের বেলায় এইজন্য দেখতে পাই না। কিন্তু সূর্য অস্ত গেলে, অন্ধকার নেমে এলে তারাগুলো এক এক করে উঁকি দেয় অন্ধকার আকাশে।

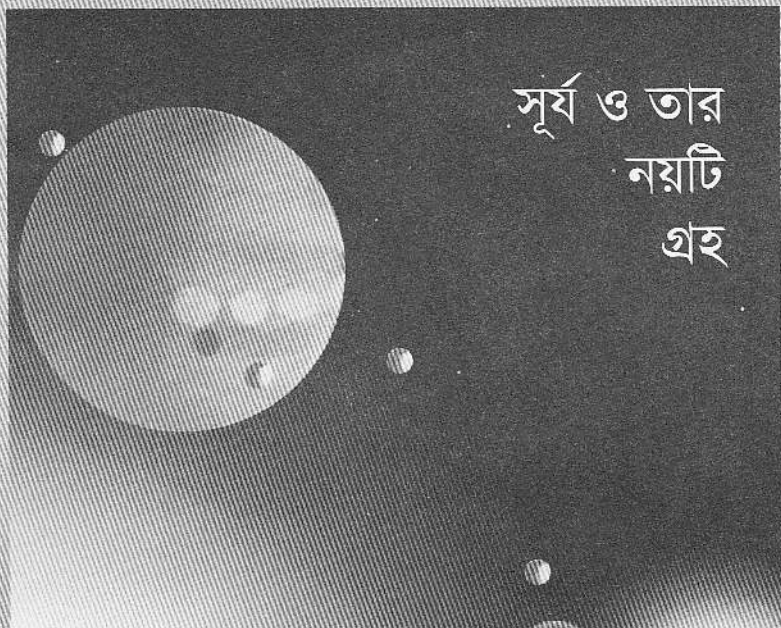

# সূর্য ও তার নয়টি গ্রহ

**সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর মতো আর কটা গ্রহ ঘুরে বেড়ায়? গ্রহগুলো দেখতে কেমন?**

সূর্যের গ্রহের সংখ্যা নয়। সবচেয়ে কাছে আছে বুধ, তারপর শুক্র, শুক্রের পরে আমাদের পৃথিবী। এরপর এক এক করে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো। প্লুটো সবচেয়ে দূরের গ্রহ।

গ্রহদের সবাই যে আকারে আর আকৃতিতে একই রকম তা নয়। কোনোটা খুব বড়, কোনোটা আবার খুব ছোট। কোনোটা আবার মাঝারি। একটা গ্রহের সাথে অন্য গ্রহের তেমন মিল পাওয়া যায় না।

আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সবাইকে নিয়ে যেমন আমাদের পরিবার তেমনি সূর্যকে নিয়ে ঘিরে আছে সৌর পরিবার। সেই পরিবারের সদস্যরা হচ্ছে গ্রহ ও নক্ষত্র।

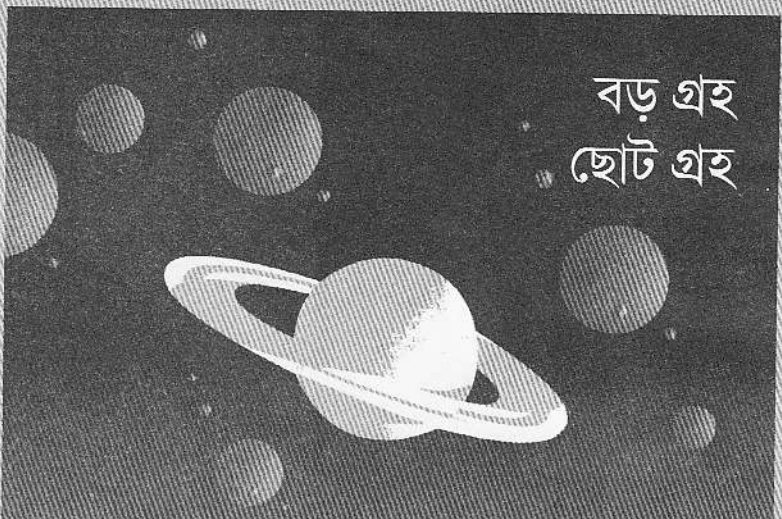

# বড় গ্রহ ছোট গ্রহ

## কোন গ্রহ সবচেয়ে বড়?

গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতি আকারে সবচেয়ে বড়। কিন্তু কত বড়? পৃথিবীর মাঝ বরাবর আকার (ব্যাসার্ধে) ১২ হাজার ৭৫৬ কিলোমিটার। আর বৃহস্পতির মাঝ বরাবর আকার (ব্যাসার্ধে) ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৮০০ কিলোমিটার। তার মানে বৃহস্পতি অনেক চওড়া, এতটা চওড়া যে এগারোটা পৃথিবীকে পাশাপাশি বসালে তবু একটা জায়গা রয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতি গোলকটার মধ্যে ১৩৮৬টা পৃথিবী ধরে যাবে। এজন্যই বৃহস্পতিকে বলা হয় গ্রহরাজ। বৃহস্পতির সঙ্গে আর কোনো গ্রহের তুলনা করা চলে না।

## কোন গ্রহ কত বড়?

সৌর পরিবারে কোন গ্রহ কত বড়, তার একটা তালিকা পাশে দেয়া হলো। সূর্যের সবচেয়ে কাছে আছে বুধ, সবচেয়ে দূরে পুটো। সূর্যের থেকে দূরত্ব ধরেই তালিকাটা সাজানো হলো। তাহলে মাঝ-বরাবর ব্যাসের হিসেবে সবচেয়ে ছোট পুটো। তার উপরেই বুধ। আর উল্টোদিকে বৃহস্পতি সবচেয়ে বড়। তার ঠিক নিচেই আছে শনি গ্রহ। সেদিক দিয়ে আমাদের পৃথিবীকে কখনোই বড় বলা যায় না।

গ্রহের আকার

| গ্রহ | ব্যাস (কিলোমিটারে) |
|---|---|
| বুধ | ৪ হাজার ৮৮০ |
| শুক্র | ১২ হাজার ১০৪ |
| পৃথিবী | ১২ হাজার ৭৫৬ |
| মঙ্গল | ৬ হাজার ৭৯৪ |
| বৃহস্পতি | ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৮০০ |
| শনি | ১ লক্ষ ২০ হাজার |
| ইউরেনাস | ৫২ হাজার ৪০০ |
| নেপচুন | ৪৯ হাজার ৫০০ |
| পুটো | ২ হাজার ৫০০ |

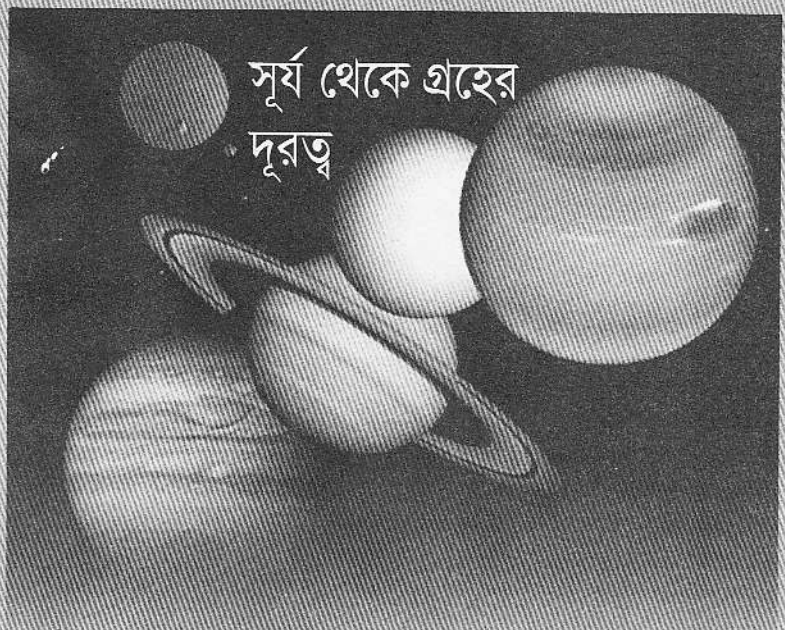

# সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্ব

## সূর্য থেকে কোন গ্রহ কত দূরে?

সূর্যের নটা গ্রহের মধ্যে বুধ আছে সূর্যের সবচেয়ে কাছে। তারপর শুক্র ও পৃথিবী। আর মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির পরে আছে ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো।

সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্ব

| গ্রহ | সূর্য থেকে দূরত্ব (কিলোমিটারে) |
|---|---|
| বুধ | ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ |
| শুক্র | ১০ কোটি ৮২ লক্ষ |
| পৃথিবী | ১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৭ হাজার |
| মঙ্গল | ২২ কোটি ৭৯ লক্ষ ৪০ হাজার |
| বৃহস্পতি | ৭৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪০ হাজার |
| শনি | ১৪২ কোটি ৭০ লক্ষ |
| ইউরেনাস | ২৮৬ কোটি ৯৬ লক্ষ |
| নেপচুন | ৪৪৯ কোটি ৬৭ লক্ষ |
| প্লুটো | ৫৯০ কোটি |

## সব গ্রহকে কি খালি চোখে দেখা যায়?

নটা গ্রহের মধ্যে ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো ছাড়া অন্য সব গ্রহকে খালি চোখে দেখা যায়। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি খুব সহজে দেখা যায়। বুধ সূর্যের খুব কাছাকাছি তবুও তাকে দেখতে কষ্ট হয়।

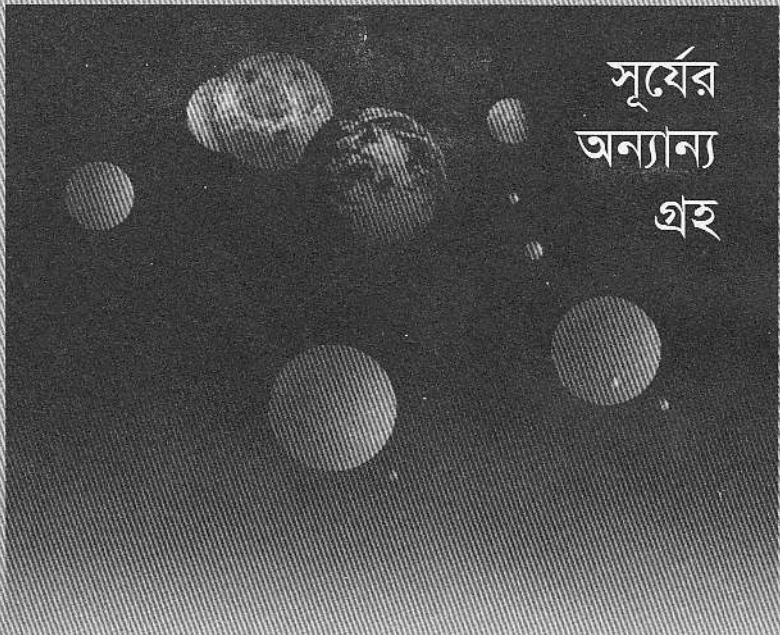

# সূর্যের অন্যান্য গ্রহ

## ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো আবিষ্কার হলো কি করে?

বিজ্ঞানীরা ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটোকে আবিষ্কার করেছেন দূরবিন আবিষ্কার হওয়ার পর। মহাকাশবিজ্ঞানীরা দূরবিন দিয়ে এদের লক্ষ্য করেছেন। ইউরেনাস নেপচুন আর প্লুটোর মধ্যে ইউরেনাস আবিষ্কার হয় সবার আগে, ১৭৮১ সালে। নেপচুন ১৮৪৬ সালে আর প্লুটো ১৯৩০ সালে আবিষ্কার হয়।

## প্লুটোর পরে আর কোনো গ্রহ কি আবিষ্কার হয়েছে?

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মহাকাশে আরো গ্রহ থাকার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেরকম কোনো গ্রহের খোঁজ এখনো পাওয়া যায়নি। এই ধরনের না-পাওয়া গ্রহকে তারা নাম দিয়েছেন প্ল্যানেট এক্স্। এরকম একটা গ্রহ পাওয়া গেলে সূর্যের গ্রহের সংখ্যা হবে ১০। কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করছেন একের অধিক গ্রহ থাকতে পারে। হয়তো কোনোদিন আবিষ্কারও হয়ে যাবে। তখন গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াবে ১১।

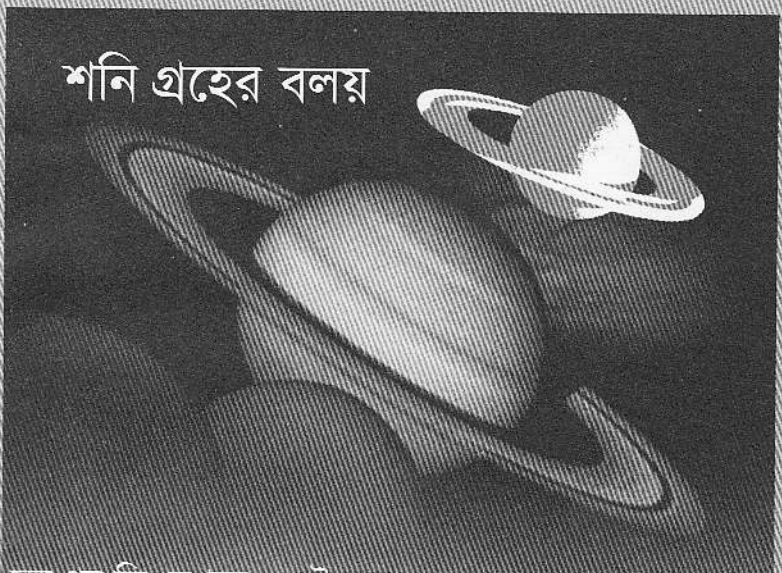

# শনি গ্রহের বলয়



## সব গ্রহ কি দেখতে একই রকম?

সূর্যের চারদিকে যে নটা গ্রহ ঘুরে বেড়ায়—চেহারা-ছবিতে তারা সবাই গোলাকার ফুটবলের মতো। কিন্তু সব কটা গ্রহ যে একই রকম দেখতে, তা নয়। খুব ভালো দূরবিন দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—বৃহস্পতিকে অসাধারণ সুন্দর মনে হবে। আর শনির সঙ্গে তো অন্য কোনো গ্রহের তুলনাই চলে না। খালি চোখে অবশ্য অন্য সব কটা গ্রহ থেকে আলাদা কিছু মনে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু দূরবিন দিয়ে দেখলে অবাক হতে হবে। শনিকে ঘিরে একটা বলয় আছে। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে ১৬১০ সালে গ্যালিলিও নামে এক বিখ্যাত ইটালির বিজ্ঞানী প্রথম শনির বলয়ের খোঁজ পান।

## শনির বলয় কয়টি?

আমরা জানি শনির একটা বলয় আছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। বিজ্ঞানীরা শনি গ্রহ সম্পর্কে বলেছেন, তার চারটি বলয় আছে। বলয়গুলো দেখা যাবে শনির মাঝ-বরাবর। একটার পর একটা, এভাবেই চারটা বলয় আছে। সবচেয়ে ভেতরের বলয়টা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন ১৯৬৯ সালে। বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, অসংখ্য আলাদা আলাদা কণায় এসব বলয় তৈরি। এক একটা বলয় অজস্র ছোট ছোট বলয়ের সমষ্টি। সেদিক দিয়ে বলা যায়, শনির বলয়ের শেষ নেই।

# নয়টি গ্রহে কি আছে?

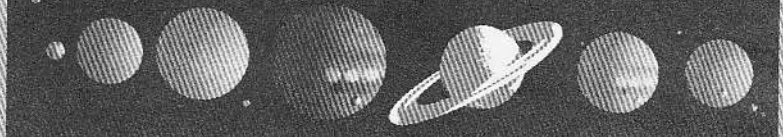

## কোন গ্রহে কি আছে?

মহাকাশে মোট নটা গ্রহ। এই নটা গ্রহের মধ্যে আমরা আমাদের পৃথিবীকে ভালোভাবে জানি। কিন্তু বাকি আটটা গ্রহ কেমন? সেখানে কি আছে?

**বুধ :** চেহারায় পাথুরে, খুব বড় গ্রহ নয়। চাঁদের প্রায় দেড়গুণ। দিনে যেমন গরম, রাতে তেমন শীত। গ্রহদের মধ্যে বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছে। এখানে পানি ও বাতাস নেই।

**শুক্র :** আকারে পৃথিবীর মতো, কিন্তু পৃথিবী থেকে অনেক আলাদা। গ্রহটা মেঘের এমন একটা পুরু চাদর দিয়ে ঢাকা যে, তা ভেদ করে শুক্রের পিঠ দেখা যায় না। শুক্রে কার্বনডাই-অক্সাইড নামে এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস বেশি আছে। তাছাড়া শুক্রের পিঠ খুব গরম। এখানে পানিও নেই। তাই এখানে প্রাণের অস্তিত্ব নেই।

**মঙ্গল :** এক সময় মনে করা হত মঙ্গলগ্রহে মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করে। তার পিঠের উপর সরলরেখার মতো দাগগুলো যেন বুদ্ধিমান প্রাণিদের হাতে কাটা খাল। কিন্তু মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, বুদ্ধিমান প্রাণী তো দূরের কথা, ছোটখাট কোনো জীবনের চিহ্নও পাওয়া যায়নি।

**বৃহস্পতি :** এখানে নানা ধরনের গ্যাসে ভরপুর। সবচেয়ে বেশি আছে হাইড্রোজেন। বৃহস্পতি আমাদের পৃথিবীর মতো নয়। বৃহস্পতির আবহওয়ার উপর দিকে খুব ঠাণ্ডা, যতই ভেতরে যাওয়া হবে ততই গরম অনুভূত হবে।

**শনি :** বৃহস্পতির মতো একটা গ্যাসের বল। আকারে কিছুটা ছোট। এখানেও হাইড্রোজেন প্রচুর। তবে শনির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, শনিকে ঘিরে থাকা চোখ জুড়ানো বলয়গুলো। এগুলো দেখতে খুব সুন্দর।

**ইউরেনাস :** ইউরেনাসও গ্যাসের গোলক। শনির মতো এরও বলয় আছে। ১৯৭৭ সালে বিজ্ঞানীরা এর নটা বলয়ের খোঁজ পেয়েছেন।

**নেপচুন :** নেপচুন এখনো রহস্যের গ্রহ। এটাও গ্যাসের গোলক।

**প্লুটো :** চেহারা-ছবিতে প্লুটো এক সামান্য গ্রহ। গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট।

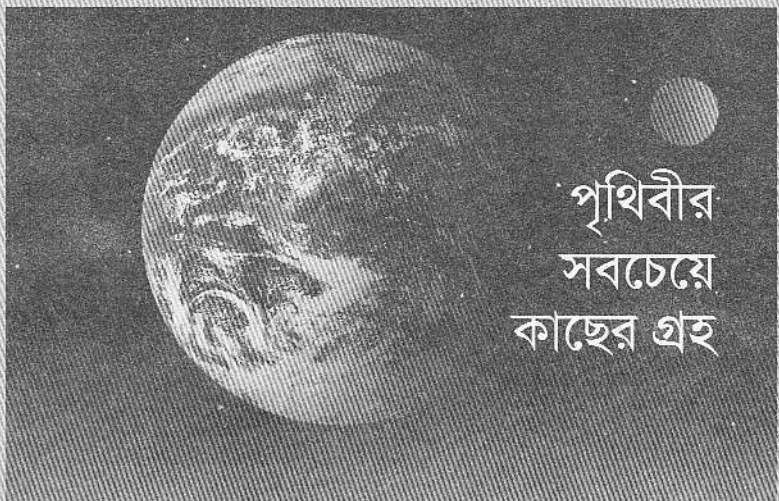

# পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ

পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ কোনটি? এই গ্রহ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কত?

সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে সবচেয়ে কাছের বুধ, পরে শুক্র ও পৃথিবী। পৃথিবীসহ সবগুলো গ্রহই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। চলার পথে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে শুক্র। যখন পৃথিবী থেকে শুক্রের দূরত্ব সবচেয়ে কম–সেটা হলো ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ কিলোমিটার।

আকাশে আমরা যখন শুক্র গ্রহকে দেখি, তখন ঔজ্জ্বল্যে অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। শুক্র চাঁদের কাছে হার মানলেও অন্য সব গ্রহের চেয়ে সে বেশি উজ্জ্বল। শুক্র গ্রহ কখনো সূর্য থেকে খুব বেশি দূরে থাকে না। সেইজন্য সূর্যাস্তের সময় একে দেখা যায় পশ্চিম আকাশে বা সূর্যোদয়ের আগে পুব আকাশে। সূর্য থেকে শুক্র গ্রহের মোটামুটি দূরত্ব ১০ কোটি ৮২ লক্ষ কিলোমিটারের মতো। আকারে শুক্র পৃথিবীর মতোই।

## শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা কি কোনো তারা?

শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা কেউ তারা নয়। শুকতারাও যা, সন্ধ্যাতারাও তা। আসলে এরা শুক্র গ্রহ। ভোরবেলায় পুব আকাশে যখন শুক্র গ্রহ দেখা যায়, তখন সে শুকতারা। আর সন্ধ্যেবেলা পশ্চিম আকাশে যখন শুক্র গ্রহকে দেখতে পাই, তখন তাকে বলি সন্ধ্যাতারা। তারা নামে ডাকলে কি হবে, শুক্র গ্রহই এদের আসল পরিচয়।

## সৌরজগৎ কাকে বলে?

সূর্যকে কেন্দ্র করে অসংখ্য গ্রহ ও নক্ষত্র সূর্যের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। সূর্য ও তার গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে যে জগৎ তাই সৌরজগৎ।

## কোন গ্রহের চলার পথের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম?

বুধ যেহেতু সূর্যের একেবারে কাছে তাই বুধ গ্রহের চলার পথের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। সূর্যের চারদিক দিয়ে তার একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে মাত্র ৮৮ দিন।

## সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে কোন গ্রহের কত সময় লাগে?

| গ্রহ | প্রদক্ষিণের সময়কাল |
|---|---|
| বুধ | ৮৮ দিন |
| শুক্র | ২২৫ দিন |
| পৃথিবী | ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা |
| মঙ্গল | ৬৮৭ দিন |
| বৃহস্পতি | ১২ বছর |
| শনি | ২৯ বছর ৬ মাস |
| ইউরেনাস | ৮৪ বছর |
| নেপচুন | ১৬৫ বছর |
| প্লুটো | ২৪৮ বছর |

## তারাদের মতো গ্রহরাও কি আকাশের সবখানে ছড়িয়ে থাকে?

রাতের আকাশ জুড়ে শুধু তারার মেলা। কিন্তু গ্রহরা তারাদের মতো আকাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই। অবশ্য পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা মাত্র নটা। তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না পশ্চিম থেকে পুব আকাশে মাথার উপর গ্রহদের কক্ষপথ।

# বার্ষিক গতি ও আহ্নিক গতি

পৃথিবী যে পথে ঘোরে, সে পথটা কি রকম? বার্ষিক গতি কাকে বলে?

সূর্যের চারদিকে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময়ে পৃথিবী যে পথে একবার ঘুরে আসে, সে পথটা কিন্তু গোলাকার নয়। একটা ডিমের আকারের মতো। এই পথ ধরে পৃথিবীর পুরো একবার ঘুরে আসার নাম পৃথিবীর বার্ষিক গতি। পৃথিবী তার কক্ষপথে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩২ কিলোমিটার পথ পশ্চিম থেকে পুবদিকে ঘুরে চলে।

আহ্নিক গতি কাকে বলে?

পৃথিবী যেমন সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের চারদিকেও ঘোরে। লাটিমের কাঁটা আর রশির বেড় যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেই মাথা-বরাবর যে রেখাটা কল্পনা করা যায়, সেটাই হল লাটিমের অক্ষ। সেইরকম পৃথিবীর নিজেরও একটা অক্ষ আছে। সে অক্ষপথে পৃথিবীও তার উত্তর ও দক্ষিণ দিক বরাবর কল্পনায় টানা এক অক্ষরেখা ধরে পাক খেয়ে চলেছে। নিজের অক্ষপথে একবার ঘুরে আসাকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলা হয়।

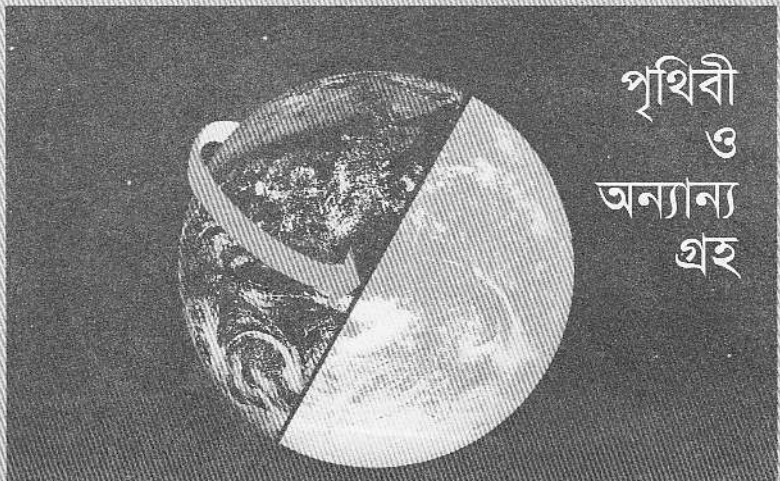

# পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ

**পৃথিবীতে একদিন হয় প্রায় ২৪ ঘণ্টায়। বিভিন্ন গ্রহে একদিন কত সময়ে হয়?**

পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপরে একবার প্রদক্ষিণ করতে যে সময় লাগে, তাই হল পৃথিবীর একদিন, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা। নিচে তালিকার মাধ্যমে কোন গ্রহের একদিনের দৈর্ঘ্য কত তা উপস্থাপন করা হলো।

| গ্রহ | দিনের দৈর্ঘ |
|---|---|
| বুধ | ৫৯ দিন |
| শুক্র | ২৪৩ দিন |
| পৃথিবী | ২৪ ঘণ্টা |
| মঙ্গল | ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট |
| বৃহস্পতি | ১০ ঘণ্টা (কয়েক মিনিট কম) |
| শনি | ১০ ঘণ্টা (কয়েক মিনিট বেশি) |
| ইউরেনাস | ১৬ ঘণ্টা |
| নেপচুন | ১৮ থেকে ১৯ ঘণ্টা |
| প্লুটো | ৬ দিন |

দিন সবচেয়ে বড় শুক্র গ্রহের। পৃথিবীর দিনের হিসেবে এক এক গ্রহে দিনের দৈর্ঘ্য এক এক রকম। পৃথিবীর ২৪০ দিনে শুক্র গ্রহের ১ দিন। বুধের ১ দিন সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে পৃথিবীর ৫৯ দিন। শুক্রের মতো না হলেও বুধের ১ দিন পৃথিবীর মতোই ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন। বৃহস্পতি আর শনিতে ১ দিন প্রায় ১০ ঘণ্টায়। পৃথিবী থেকে এদেরও দিনের দৈর্ঘ্য কম। ইউরেনাস ও নেপচুনের দিনের দৈর্ঘ্য বৃহস্পতি আর শনির থেকে বেশি। কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে কম। আবার দূরতম গ্রহ প্লুটোর ১ দিন পৃথিবীর ৬ দিনের মতো। ইউরেনাস আর নেপচুনের হিসাব বিজ্ঞানীদের অনুমান করতে হয়েছে।

## রোজ কেন দিন-রাত হয়? দিন কেন ২৪ ঘণ্টার?

পৃথিবী নিজের অক্ষের উপরে ঘুরে চলে নিয়মিত, অনেকটা লাটিমের মতো। লাটিম যখন ঘোরে তখন সে এক পাক দেয় খুব কম সময়ে তাড়াতাড়ি। তার পাক দেওয়ার সময়টা আমরা চট করে বুঝতে পারি না। কিন্তু পৃথিবীর পাক দেওয়ার সময় বিজ্ঞানীরা মেপে ২৪ ঘণ্টার মতো সময় বের করেছেন। এই প্রদক্ষিণের সময় পৃথিবীর একটা পিঠ একবার সূর্যের সামনে আসে, আর একবার আড়ালে চলে যায়। যখন সামনে আসে তখন দিন, আর যখন আড়ালে চলে তখন রাত হয়। আর এভাবে একবার প্রদক্ষিণের ফলে একটা দিন আর একটা রাত হয়। এভাবে অবিরাম চলে দিন রাতের খেলা। আর এই প্রদক্ষিণে দিন-রাত মিলে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা।

## সূর্য কেন পুব থেকে পশ্চিমে যায়?

আমরা দেখি সূর্য রোজ পুব আকাশে ওঠে, আর পশ্চিমে অস্ত যায়। আসলে পৃথিবী তার আহ্নিক গতির ফলে রোজ তার অক্ষরেখা ধরে পশ্চিম থেকে পুবদিক দিয়ে একটা পাক শেষ করে। পৃথিবী ঘোরে পশ্চিম থেকে পুবে আর আমাদের মনে হয় সূর্য পুব দিকে ওঠে আর পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।

## রাতে সূর্য দেখা যায় না কেন?

দিনের বেলায় আমরা রোজ সূর্যকে দেখতে পাই। কিন্তু রাতের বেলায় সে সূর্য যেন কোথায় ডুব দেয়। কিন্তু কেন? আহ্নিক গতির কক্ষপথে ঘোরার সময় পৃথিবীর যে দিকটা সূর্যের সামনে আসে তখন সেখানে দিন, আর অন্যদিকটা রাত। পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপরে প্রদক্ষিণ করে বলেই এমনটা হয়। আমাদের এখানে যখন দিন আমেরিকায় তখন রাত।

## সূর্য থেকে কোন গ্রহের দূরত্ব কত?

বিজ্ঞানীরা এক এক করে সব গ্রহকে দূরত্বের হিসেবে সাজানোর সময় দেখলেন, সূর্য থেকে বুধ গ্রহের দূরত্ব ৫ কোটি কিলোমিটার, শুক্রের ১০ কোটি, পৃথিবীর ১৫ কোটি আর মঙ্গলের ২২ কোটি কিলোমিটার। তবে সূর্য থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব ৭৭ কোটি কিলোমিটার। তবে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে রয়েছে অসংখ্য গ্রহাণুপুঞ্জ।

## গ্রহাণু কাকে বলে? গ্রহাণু কোথায় দেখা যায়?

যা গ্রহ নয়, গ্রহের চেয়ে আকারে অনেক ছোট, তারাই গ্রহাণু। মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষপথের মধ্যে গ্রহাণুগুলির যেখানে থাকা উচিত, বলতে গেলে গ্রহাণুদের প্রায় সবাই আছে সেখানেই। গ্রহদের মতো এরাও সূর্যের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। আচরণে এরা গ্রহের মতো।

## গ্রহাণু সংখ্যা কত?

আজ পর্যন্ত গ্রহাণুদের যে সংখ্যাটা বিজ্ঞানীরা তালিকাভুক্ত করেছেন, তা ২০০০-এর মতো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গ্রহাণু আবিষ্কারের পরে প্রথম ৪৫ বছরে আবিষ্কৃত গ্রহাণুর সংখ্যা মাত্র ৫। তবে বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন, গ্রহাণুর সংখ্যা এক লাখেরও বেশি।

## সবচেয়ে বড় গ্রহাণু কোনটা?

আজ পর্যন্ত যত গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো সিরিজ (Ceres)। গ্রহাণুটির ব্যাস ১০০৬ কিলোমিটার। এটি আবিষ্কৃত হয় একেবারে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ১৮০১ সালে। খালি চোখে এই গ্রহাণুটিকে দেখা যায় না।

## তারা কেন খসে পড়ে? খসে পড়া তারাদের কখন দেখা যায়?

মেঘমুক্ত রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা অনেক সময় দেখতে পাই, হঠাৎ যেন একটা তারা খসে পড়ছে আকাশ থেকে। মনে হয় উজ্জ্বল একটা আলোর রেখা আকাশ থেকে নেমে আসছে। তারপর দেখতে দেখতে সে আলো মিলিয়েও যায়। এটাকে আমরা বলি তারাখসা। মহাকাশে কিছু কিছু বস্তু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কেউ ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, কেউ প্রায় স্থির। এইসব ঘুরে বেড়ানো বস্তুগুলো কখনো কখনো পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পড়ে। তখন আর এদের নিস্তার নেই। পৃথিবীর টানে এরা ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে। আর পৃথিবীর চারদিকে যে আবহাওয়ার চাদর আছে, তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে জ্বলে ওঠে। এই জ্বলে ওঠার সময় আমরা এদের দেখতে পাই। এটাকেই আমরা বলি উল্কাপাত বা তারাখসা।

## উল্কার কি নিজের আলো আছে?

উল্কার সঙ্গে আমার পরিচয় তাদের জ্বলে ওঠার ভেতর দিয়ে। কিন্তু উল্কার নিজের কোনো আলো নেই। সেই সঙ্গে উল্কারা কোনো তাপও দেয় না। তাপ নেই, আলো নেই–উল্কারা এমন এক ধরনের বস্তু। কখনো কখনো সম্পূর্ণ ছাই না হয়েও তা পৃথিবীতে এসে আছড়ে পড়ে।

## উল্কা কি তারা?

আমরা উল্কাপাত বা তারাখসা বলি বটে, কিন্তু উল্কারা কোনো তারা নয়। তারাদের নিজেদের আলো আছে, তাপও দেয়। কিন্তু উল্কারা সে রকম নয়। তাছাড়া উল্কাদের আমরা ছুটে চলতে দেখি। আকাশপটে তারকাগুলো ওভাবে ছুটে চলে না।

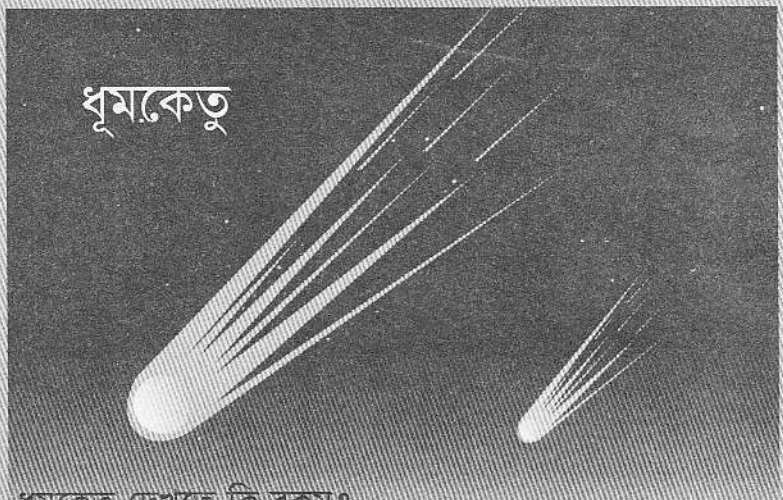

# ধূমকেতু



## ধূমকেতু দেখতে কি রকম?

ধূমকেতু দেখতে অনেকটা ঝাঁটার মতো। এর একটা মাথা আছে, মাথার ভেতরের দিকটা কঠিন। আর আকাশে যখন সে আমাদের চোখে ধরা পড়ে, তখন ঝাঁটার মতো একটা লেজ বের হয়। ধূমকেতুর দেহটা এমন যে, যখন কোনো ধূমকেতু সূর্যের কাছে এগিয়ে আসে, তখন সূর্যের তাপ বেশি পরিমাণে পেতে থাকে। ফলে ধূমকেতুর দেহের অনেকটাই গ্যাস হয়ে যায়। আর তা সূর্যের উল্টোদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

## ধূমকেতু কি গ্রহ?

গ্রহদের সাথে অনেক মিল আছে ধূমকেতুর। গ্রহেরা যেমন সূর্যের আলোতেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ধূমকেতুরাও সেরকমই। এদের নিজেদের কোনো আলো নেই। গ্রহদের মতো এরাও সূর্যপরিবারের সদস্য। তবে ধূমকেতুর চলার পথ অনেকটা লম্বাটে।

## হ্যালির ধূমকেতু কি?

এ্যাডমন্ড হ্যালি নামে ইংল্যান্ডের একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৬৫৬ সালে, আর মৃত্যুবরণ করেন ১৭৪২ সালে। ইনিই প্রথম এই ধূমকেতুটির কক্ষপথের খোঁজ পান। ১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতুকে দেখা যায়। এরপর এই ধূমকেতু দেখা যায় ১৯৮৬ সালে। এরপর ধূমকেতুটিকে দেখার জন্য বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা করতে হবে ২০৬২ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ ৭৬ বছর পরপর এই ধূমকেতুটি দেখা যায়। হ্যালির ধূমকেতু প্রথম যে আকার আর আলো নিয়ে আসে, পরের বার তাকে আর ঠিক সেভাবে দেখা যায়নি। সে আগের আকার ও ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে।

# তারকামণ্ডল ও সপ্তর্ষিমণ্ডল

## তারকামণ্ডল কি? তারকামণ্ডল চেনা যায় কিভাবে?

আকাশের বুকে ছড়িয়ে থাকা তারাদের নিয়ে প্রাচীনকালের মহাকাশবিজ্ঞানীরা অনেক তারকামণ্ডলের কল্পনা করেন। এক একটি তারকামণ্ডলে অনেক তারা থাকে। তারকামণ্ডলকে চেনার জন্যে তারায় তারায় এক-একটা ছবি কল্পনা করেছেন প্রাচীনকালের বিজ্ঞানীরা। আর তারকামণ্ডলের নাম দিয়েছেন—জীবজন্তুর নাম, দেব-দেবীর নাম, কোথাও আবার অপ্রাণীবাচক কোনোকিছুর নাম। সেই ছবির সঙ্গে তারকামণ্ডলের কোথাও খুব মিল, কোথাও আবার মিল নেই।

## মহাকাশে কতগুলো তারকামণ্ডল আছে?

মহাকাশবিজ্ঞানীরা মোট ৮৮টি তারকামণ্ডলে ভাগ করেছেন। কোনোটা ছোট, আবার কোনোটা বড়। তারকামণ্ডলের নাম থেকে জানা যায় কোনটার কথা বলা হচ্ছে।

## সপ্তর্ষিমণ্ডল কাকে বলে? কখন আর কোথায় দেখা যায় তাকে? সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারার নাম কি?

সপ্তর্ষিমণ্ডল একটি তারকামণ্ডল। সপ্তর্ষি কথাটার মধ্যে সপ্ত ঋষি আছে অর্থাৎ সাতজন ঋষি। সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারার উজ্জ্বলতা অনেক বেশি। উত্তর আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায় মাথার উপরে উঠে আসে অনেকটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের আকারে। চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখা যায়। জিজ্ঞাসা চিহ্নের মুখটা আছে উত্তর দিকে আর লেজটা আছে পুব আকাশে। পুব থেকে পশ্চিম দিক পর্যন্ত পর পর সাতটি তারার নাম মরীচি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু। সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠের সঙ্গে আর একটি অনুজ্জ্বল তারা নজরে আসে। এই তারাটির নাম অরুন্ধতী। ইংরেজিতে সপ্তর্ষিমন্ডলকে গ্রেট বিয়ার (Great Bear) বলা হয়।

## কালপুরুষ কি?

মহাকাশে অনেক তারকামণ্ডলের মধ্যে কালপুরুষ মন্ডল দেখার মতো। উজ্জ্বল তারায় তারায় কালপুরুষে একটা পুরুষের আকৃতি। খাপে ঢাকা তলোয়ার, হাতে ঢাল—এমন সুন্দর তারকাচিত্র চিনতে একটুও অসুবিধা হয় না। এর ডান কাঁধের উজ্জ্বল তারাটির নাম আর্দ্রা। উল্টোদিকে বাঁ পায়ের তারাটিও দেখা যায়। উজ্জ্বল এই তারাটির নাম বাণরাজা। কালপুরুষ মণ্ডলকে দেখা যায় মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সন্ধ্যার পর আকাশের কিছুটা দক্ষিণ দিকে। কালপুরুষের মাথা আছে আকাশের উত্তর দিকে। দেহটা ক্রমে নেমে গেছে দক্ষিণের আকাশে। কালপুরুষের নাম ওরায়ন (Orion)।

## ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia) কি?

ক্যাসিওপিয়া একটি তারকামণ্ডল। উত্তর আকাশের এই মন্ডলটি আকারে অনেকটা ইংরেজি W-এর মতো। পাঁচটি উজ্জ্বল তারায় গঠিত ক্যাসিওপিয়া। অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ মাসে সন্ধের অন্ধকারে ক্যাসিওপিয়া মন্ডলটিকে দেখতে পাওয়া যায় উত্তর আকাশে।

## তারকামণ্ডলগুলোকে রোজ একই সময় এক জায়গায় দেখা যায় না কেন?

পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য এক-একটা তারা যেমন পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যায়, তেমনি তারকামণ্ডলও সরে যায়। সন্ধেবেলায় যে তারকামণ্ডলকে দেখা যায় পুব আকাশে, মাঝ রাতে তাকে দেখা যায় মাথার উপরে, ভোর রাতে আবার পশ্চিম আকাশে। তারা ও তারকামণ্ডল প্রতিদিন একটু একটু সরে যায়। একদিনে কতটা সরলো বোঝা যায় না, তবে এক মাস পরে হিসেব করলে সরে যাওয়ার পরিমাণটা বোঝা যায়।

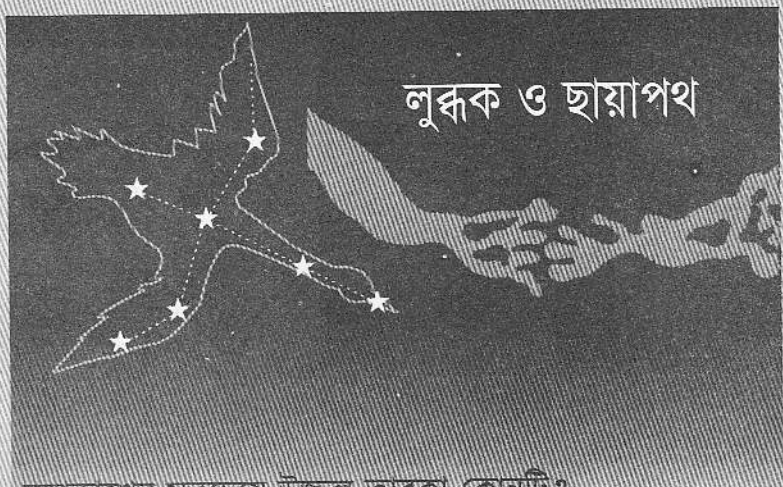

# লুব্ধক ও ছায়াপথ

## মহাকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা কোনটি?

উত্তর-দক্ষিণ আকাশজুড়ে সারা বছর যত তারকা দেখা যায়, তার মধ্যে কোনো কোনো তারকাকে বেশ উজ্জ্বল দেখা যায়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দক্ষিণ আকাশে কালপুরুষ মণ্ডলের সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে একটি অতি উজ্জ্বল তারা দেখা যায়, এই তারাটির নাম লুব্ধক। ইংরেজিতে এর নাম সিরিয়াস (Sirius)। এই তারাটি খালি চোখে দেখা সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা। অথচ আমাদের পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১০ হাজার কোটি কিলোমিটার।

## লুব্ধক আছে কোন্ তারকামণ্ডলে?

দক্ষিণ-আকাশে একটি তারকামণ্ডল আছে, তার নাম বৃহৎ কুকুর মণ্ডল। বিজ্ঞানীদের ভাষায় ক্যানিস মেজর (Canis Major)। লুব্ধক ওই ক্যানিস মেজর মণ্ডলের তারকা। খালি চোখে লুব্ধককে অতি সহজে চেনা যায়। লুব্ধক যে মণ্ডলে আছে, সেই ক্যানিস মেজর মণ্ডলের তারায় তারায় একটা বড় কুকুরের ছবি ফুটিয়ে তোলা যায়। লুব্ধক আছে সেই কুকুরটার একেবারে উত্তর দিকে। মণ্ডলটির পূর্ব দিক দিয়ে গিয়েছে ছায়াপথ। লুব্ধক আছে ছায়াপথের কোল ঘেঁষে।

## ছায়াপথ কাকে বলে? ছায়াপথ কোথায় দেখা যায়?

মেঘমুক্ত অন্ধকার আকাশে কোথাও সরু, কোথাও চওড়া একটা পথের মতো দেখা যায়। দুধ যেমন সাদা, পথটা তেমনই শুভ্র। এই পথটাই হচ্ছে ছায়াপথ। ছায়াপথ মহাকাশে আড়াআড়ি বেষ্টন করে থাকে। আকাশের অসংখ্য তারার মালার মাঝেও খুব কাছাকাছি থাকার জন্যে ছায়াপথ প্রায় সবার চোখেই ধরা পড়েছে।

# ধ্রুবতারা

## ধ্রুবতারা কোথায় থাকে?

আকাশের একেবারে উত্তর দিকে ধ্রুবতারার অবস্থান। তেমন উজ্জ্বল নয় তারাটি। সেইজন্যে সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডলের জিজ্ঞাসা-চিহ্ন আকারের একেবারে মুখের তারা দুটি–পুলহ ও ক্রতুকে যোগ করে কাল্পনিক সরলরেখাটিকে উত্তর দিকে বাড়িয়ে দিলে যে তারাটিতে গিয়ে পৌঁছায়, সেটাই ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারাকে নিয়েও একটা তারকামণ্ডল আছে। এর নাম শিশুমার মণ্ডল, ইংরেজি নাম লিট্‌ল্ বিয়ার (Little Bear)। লিটল বিয়ার আর গ্রেট বিয়ার মানে একটা ছোট আর একটা বড়। তবে সপ্তর্ষি আর শিশুমারের চেহারায় খুব মিল। কিন্তু শিশুমারের তারাগুলে যেমন ম্লান, সপ্তর্ষি সেখানে উজ্জ্বল।

## ধ্রুবতারা কি স্থির?

ধ্রুব অর্থ স্থির। আর সে কারণেই ধ্রুবতারা স্থির। আকাশে সব তারার সঙ্গে ধ্রুবতারার এটাই পার্থক্য। অন্য সব তারা আকাশে নিয়ম করে চলে। কিন্তু ধ্রুবতারা স্থির।

## ধ্রুবতারা স্থির কেন?

পৃথিবী তার আহ্নিক গতির ফলে যে অক্ষের উপরে পাক দেয়, ধ্রুবতারাটি আছে প্রায় উত্তর দিকের সেই অক্ষের উপরে। তার ফলে পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপরে পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য তারারাও সরে যায় কিন্তু পশ্চিমের আকাশে ধ্রুবতারা একেবারে স্থির থাকে।

ধ্রুবতারা স্থির হওয়ার জন্যে একসময় মানুষ অন্ধকারে পথ চলার দিশা খুঁজে পেয়েছে। ধ্রুবতারা যেহেতু মাটি থেকে কিছুটা উপরে আকাশের একেবারে উত্তর প্রান্তে স্থির তাই রাতের অন্ধকারে আগেকারে পথিকেরা ঠিক দিক মিলিয়ে নিতে পারতো। কোন্ দিকে চলছে বুঝতে অসুবিধা হতো না।

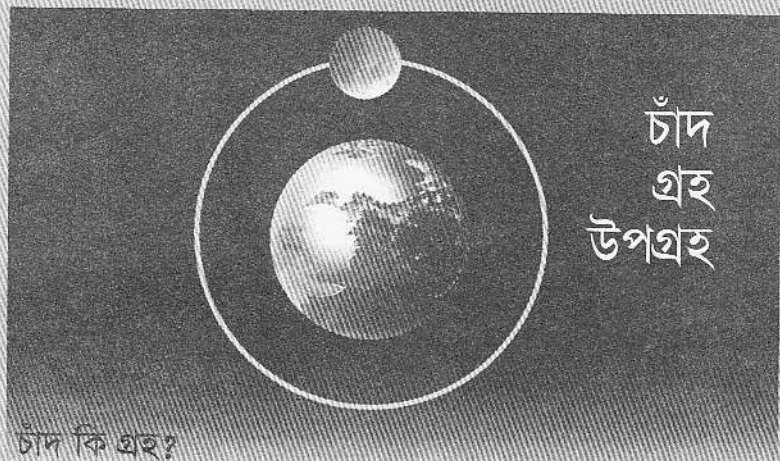

# চাঁদ গ্রহ উপগ্রহ

## চাঁদ কি গ্রহ?

শনি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র যেমন গ্রহ চাঁদ সেরকম কোনো গ্রহ নয়। সূর্যের আলোয় চাঁদ আলোকিত হয়। তার নিজের কোনো আলো নেই। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ।

## উপগ্রহ কাকে বলে?

আকাশে যেসব বস্তু গ্রহের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, তারা হল উপগ্রহ। গ্রহের সঙ্গে উপগ্রহ কথাটার মিল আছে। গ্রহের আগে উপ যোগ করে উপগ্রহ কথাটা এসেছে। পৃথিবী একটা গ্রহ। এই পৃথিবীকে ঘিরে যদি কেউ ঘোরে তাহলে সে পৃথিবীর উপগ্রহ। চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ায়। সেজন্য চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ।

## পৃথিবীর মতো সব গ্রহেরই কি উপগ্রহ আছে?

সব গ্রহের উপগ্রহ থাকবে, এমন কোনো কথা নেই। বুধ আর শুক্র গ্রহের কোনো উপগ্রহ নেই। পৃথিবী ছাড়া মঙ্গলের উপগ্রহের সংখ্যা ২, বৃহস্পতির ১৬, শনির ২১, ইউরেনাসের ৫, নেপচুনের ২ আর প্লুটোর উপগ্রহের সংখ্যা ১। তাহলে উপগ্রহের মোট সংখ্যা ৪৮।

## উপগ্রহ কি গ্রহদের মতো?

উপগ্রহেরা অনেকটা গ্রহদের মতো। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে। চাঁদও পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর সঙ্গে আবার সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। উপগ্রহেরা আকারে খুব বড় নয়। আর উপগ্রহ যে গ্রহের চারপাশের ঘোরে তার চেয়ে ছোট। চাঁদও পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট।

## চাঁদের আলো কি তার নিজের আলো?

চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই। তাহলে চাঁদ এত উজ্জ্বল কেন? অন্যান্য গ্রহদের মতো চাঁদের আলোও সূর্যের কাছ থেকে আলো ধার করা। ধার করা আলো নিয়েও চাঁদের স্নিগ্ধ আলো পৃথিবীকে স্বপ্নময় করে তোলে। পূর্ণিমার রাতে আমরা চাঁদের আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাই।

# চাঁদের আকার চাঁদের কলঙ্ক

## চাঁদের আকার কেমন?

আকাশে যখন গোল আকারের পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যায়, তখন চাঁদ দেখি, তখন চাঁদটাকে খুব বড় মনে হয়। অনেকটা আমাদের আকাশের সূর্যের মতো। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ কিন্তু সূর্যের মতো বড় নয়। চাঁদ সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট। চাঁদের ব্যাস ৩৪৭৬ কিলোমিটার আর সূর্যের ব্যাস প্রায় ১৪ লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব মাত্র ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার। আর পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার। সূর্য চাঁদের চেয়ে অনেক বড় হলেও আকাশে গোল আকারের চাঁদকে ছোট মনে হয় না, কারণ চাঁদ সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর অনেক কাছাকাছি।

## চাঁদের কি কোনো কলঙ্ক আছে?

রাতের আকাশে সুন্দর চাঁদের দিকে তাকিয়ে এককালে মানুষ মনে করতো, চাঁদের গায়ে যেসব রেখা দেখা যায়, তারা যেন চাঁদের কলঙ্ক। কিন্তু দূরবিন আবিষ্কার করার পরে বিজ্ঞানীরা চাঁদের কলঙ্ককে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তাঁরা বললেন, চাঁদের পিঠ অত্যন্ত এবড়ো-খেবড়ো, অসমান। সেখানে কালো কালো দাগ নজরে আসে। এই দাগগুলিই আমাদের কাছে চাঁদের কলঙ্ক। এককালে ছোট দূরবিনে দেখা বিজ্ঞানীরা এই কালো দাগগুলিকে মনে করতেন চাঁদের সাগর। সেজন্যে কোনোটার নাম দিলেন তাঁরা শান্ত সাগর, কোনোটার আবার মৃত সাগর। পরে যখন আরও ভালো দূরবিন আবিষ্কার হল, তখন দেখা গেল চাঁদে মোটেই পানি নেই, সেজন্যে সমুদ্রও নেই। চাঁদের এবড়ো-খেবড়ো পটভূমিতে আছে ছোট বড় অনেক জ্বালামুখ বা উঁচু দেওয়ালে ঘেরা খাদ আর সেই সঙ্গে পাহাড়-পর্বত। আমাদের পৃথিবীতে যেমন ককেসাস পর্বত, আল্‌প্‌স পর্বত, চাঁদেও তেমনি এরকম অনেক পাহাড় আছে। চাঁদে এক-একটা খাদের নামও রাখা হয়েছে এক-এক বিজ্ঞানীর নামে। কোনোটার সঙ্গে যোগ হয়েছে নিউটনের নাম, কোনোটার সঙ্গে আবার কোপারনিকাস বা গ্যালিলিও-এর নাম—বিজ্ঞানী হিসেবে যাঁদের খ্যাতি সারা বিশ্বজুড়ে।

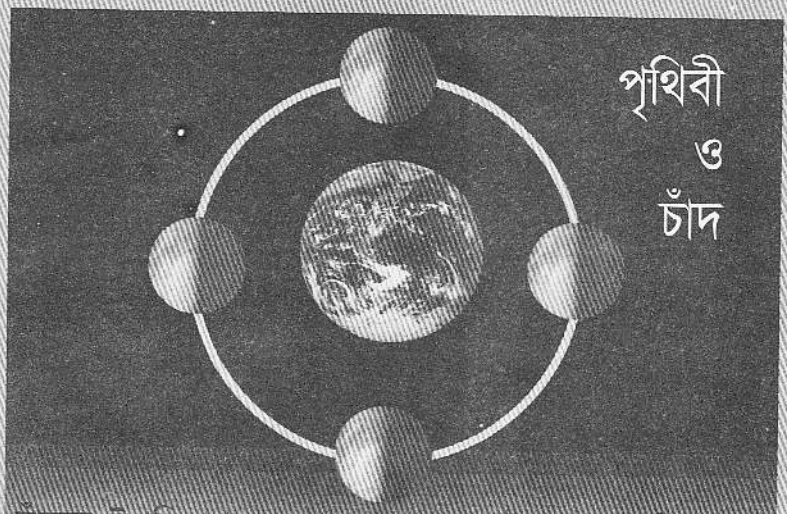


## চাঁদের উপরিভাগ আমরা সবসময় একই রকম দেখি কেন? চাঁদের অন্য পিঠটা আমরা দেখি না কেন?

পৃথিবী থেকে কেউ কখনো চাঁদের দুটো পিঠ দেখতে পায়না। চাঁদ তার নিজের অক্ষের উপরে পাক দেয়ার সঙ্গে পৃথিবীর চারদিক দিয়েও ঘুরে যায়। পৃথিবী যেমন নিজের অক্ষের উপর পাক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের চারদিক দিয়ে ঘোরে ঠিক তেমন। কিন্তু চাঁদের বেলায় এই দুটো অক্ষ পরিভ্রমণের সময় এক। নিজের অক্ষের উপরে একবার ঘুরতে তার সময় লাগে ২৭ দিন ৮ ঘণ্টার মতো। পৃথিবীর চারদিক দিয়ে পরিভ্রমণের সময়ওই তার একই। এটা একটা আশ্চর্য মিল। এ কারণে চাঁদের সবসময় নিজের অক্ষের উপরে পরিভ্রমণ করা আর পৃথিবীর চারদিক দিয়ে পরিভ্রমণ করা এমনভাবে হয় যে, চাঁদের একটা পিঠই সবসময় আমাদের চোখে পড়ে, অন্য পিঠটা নয়। তবে এখন মহাকাশবিজ্ঞানীরা মহাকাশে গিয়ে চাঁদের উল্টো পিঠের ছবি তুলে এনেছে। ছবি থেকে প্রমাণিত হয়েছে চাঁদের উল্টো পিঠটাও একইরকম।

## আমরা চাঁদকে প্রতি রাতে দেখতে পাই না কেন?

চাঁদের আলো তার নিজের আলো নয়, সূর্যের আলোয় তার আলো। ফলে চাঁদের যে পিঠটা সূর্যের দিকে থাকে, সে পিঠ আলো পায়, অন্য পিঠ একেবারে অন্ধকার। যেদিন চাঁদ আর পৃথিবীর পরিভ্রমণের পথে চাঁদ সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে আসে, সেদিন চাঁদের একটা দিক সূর্যের আলোর মুখে থাকে, আর উল্টো দিকটা অর্থাৎ অন্ধকার দিকটা থাকে পৃথিবীর দিকে। আর অন্ধকারে কি কিছু দেখা যায়? সেজন্য সে সময় চাঁদ আমাদের একেবারেই নজরে আসে না। এই দিনটাকে বলা হয় অমাবস্যা। চাঁদের আলো থাকে না বলে অমাবস্যায় চারদিক একেবারে অন্ধকার। আর তাই প্রতি রাতে চাঁদকে দেখা যায় না।

# অমাবস্যা ও পূর্ণিমা

## পূর্ণিমার সময় কেন পুরো চাঁদটাকে দেখা যায়?

চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে, সেই সঙ্গে সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে পৃথিবী। একইরকম ঘুরে চলার পথে যখন পৃথিবীর একদিকে থাকে চাঁদ, আর একদিকে সূর্য অর্থাৎ পৃথিবী থাকে চাঁদ আর সূর্যের মাঝখানে, সেদিন সূর্যের আলো পাওয়া চাঁদের অর্ধেকটাই পৃথিবী থেকে দেখা যায়। এ দিনটাই পূর্ণিমা। এ সময়টা মনে হয় চাঁদের আলোয় যেন চারপাশ ভেসে যাচ্ছে। অর্ধেক চাঁদ যদি পুরোটাই আলো পায়, তাহলে সেই চাঁদকে গোল চাঁদ বলে মনে হয়।

## আকাশে আমরা কেন একফালি চাঁদ দেখতে পাই?

অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমার মাঝে সরু একফালি বাঁকা চাঁদ দেখা যায়। এর কারণ অমাবস্যার সময় পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে থাকে চাঁদ। সূর্যের আলোর মুখে চাঁদের অন্ধকার অংশটা থাকে পৃথিবীর দিকে মুখ করে। সেজন্যে পৃথিবী থেকে চাঁদকে দেখা যায় না। কিন্তু অমাবস্যার পরের দিন থেকে চাঁদ আর পৃথিবীর গতির এমনই বৈশিষ্ট্য যে, পৃথিবী থেকে চাঁদের সামান্য আলোকিত অংশ নজরে পড়ে। এভাবে দিনে দিনে চাঁদের ফালি বড় হয় আর শেষ পর্যন্ত পূর্ণিমায় তা গোলাকার হয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পূর্ণিমার পরে আবার উল্টো ব্যাপার। তখন চাঁদকে আমরা ক্ষয়ে যেতে দেখি। পৃথিবী থেকে চাঁদের সম্পূর্ণ আলো-পড়া অংশটা তখন দেখা যায় না। এভাবে দেখতে না পাওয়া অংশটার পরিমাণ বাড়তে থাকে।

## অমাবস্যা কখন হয়?

পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে, পৃথিবীর চারপাশে আবার ঘুরছে চাঁদ। এভাবে ঘোরার পথে চাঁদ যখন পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে আসে, তখন চাঁদের যে পিঠে সূর্যের আলো পড়ে, সে পিঠটা দেখা যায় না। চাঁদের যে দিকে সূর্য আছে, পৃথিবী আছে তার উল্টো দিকে ফলে পৃথিবী থেকে চাঁদের উল্টো দিকটা অর্থাৎ অন্ধকার দিকটা আমাদের চোখে পড়ে। চাঁদের অন্ধকার পিঠ পৃথিবীর দিকে যখন পড়ে, তখনই আসে অমাবস্যা।

## পূর্ণিমা কখন হয়?

মহাকাশে গ্রহ, উপগ্রহের আপন কক্ষপথে ঘোরার ফলে এক সময় পৃথিবী আসে সূর্য আর চাঁদের মাঝখানে। তখন পৃথিবীর যে দিকে সূর্য থাকে, চাঁদ থাকে তার বিপরীত দিকে। আর সূর্যের আলো পড়ে চাঁদের যে দিকটা আলোকিত হয়, পৃথিবী সেদিকে থাকে। ফলে পৃথিবী থেকে চাঁদের আলোকিত অংশটি দেখা যায়। তখন হয় পূর্ণিমা। আমরা চাঁদের আলোয় স্নিগ্ধ হই।

## চন্দ্রগ্রহণ কখন হয়?

পূর্ণিমার সময় পৃথিবীর যে দিকে সূর্য থাকে, চাঁদ থাকে তার বিপরীত দিকে। এ সময় মনে হয় তারা একটা সরলরেখায় থাকবে। কিন্তু পূর্ণিমা হলেই যে তারা একটা সরলরেখায় চলে আসবে, এমন কথা বলা যাবে না। আবার প্রায় একই সরলরেখার উপরে চলেও আসতে পারে। আর কোনো পূর্ণিমায় পৃথিবী, সূর্য আর চাঁদ যদি একই সরলরেখায় চলে আসে তখন সূর্যের আলো এসে পৃথিবীতে বাধা পাবে। বাধা পেলে সে ছায়া ফেলবে আর সে ছায়া গিয়ে পড়বে চাঁদের উপর। ফলে তখন চাঁদের আলোকিত অংশটা ঢাকা পড়ে যাবে পৃথিবীর ছায়ায়। ফলে পৃথিবীর যে অংশ থেকে চাঁদকে দেখতে পাওয়ার কথা, সে অংশ থেকে আর চাঁদকে দেখা যায় না। একেই আমরা বলি চন্দ্রগ্রহণ।

## সূর্যগ্রহণ কখন হয়?

অমাবস্যার সময় চাঁদের যে দিকে সূর্য থাকে, তার বিপরীত দিকে থাকে পৃথিবী। পূর্ণিমায় চাঁদ, সূর্য আর পৃথিবী এক সরলরেখায় থাকে না। কিন্তু কোনো অমাবস্যায় যদি চাঁদ, সূর্য আর পৃথিবী এক সরলরেখায় এসে পড়ে, তখন সূর্যের আলো চাঁদে বাধা পেয়ে ছায়া ফেলে পৃথিবীর একটা অংশের উপরে। পৃথিবীর ওই অংশটা থেকে তখন আর সূর্যকে দেখা যায় না। সূর্যকে আড়াল করে রাখে চাঁদ। অর্থাৎ পৃথিবীর যে অংশে চাঁদের ছায়া পড়ে, সেই অংশে তখন সূর্যগ্রহণ হয়। চাঁদের বাধা সরে গেলে আবার সূর্যকে দেখা যায়।

## বছরে কটা গ্রহণ হয়?

চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ মিলে সারা বছরে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ হতে পারে সাতটা। তবে সবকটাই সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ কি কখনো হয়? সাতটা গ্রহণ হলে সূর্যগ্রহণ পাঁচ আর চন্দ্রগ্রহণ দুই বা সূর্যগ্রহণ চার আর চন্দ্রগ্রহণ তিন। বছরে গ্রহণের সংখ্যা কম হলে হবে দুটি গ্রহণ। আর এ দুটিই হবে সূর্যগ্রহণ।

# পৃথিবীর আকার

উত্তর গোলার্ধ
দক্ষিণ গোলার্ধ
উত্তর মেরু
দক্ষিণ মেরু

## পৃথিবী চ্যাপটা না গোলাকার?

পৃথিবী গোলাকার কিন্তু অনেক আগে মানুষ মনে করতো, পৃথিবী চ্যাপটা একটা থালার মতো। গোলাকার পৃথিবীর মাঝ-বরাবর ব্যাস অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিমের ব্যাস উত্তর-দক্ষিণের ব্যাসের চেয়ে সামান্য বড়। পৃথিবীটা উত্তর-দক্ষিণে সামান্য চ্যাপটা, অনেকটা কমলালেবুর মতো। খোলা মাঠে অথবা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আমরা যদি অনেক দূর পর্যন্ত তাকাই, তাহলে দেখা যাবে আকাশ এসে মাটিতে মিশে গেছে। কিন্তু কোনো উঁচু বিল্ডিঙের উপর দাঁড়িয়ে যদি দেখা যায় তাহলে মনে হবে আকাশের সীমানা আরো বড় হয়েছে। এমনটা মনে হয় কারণ পৃথিবী গোলাকার।

## পৃথিবীকে সমতল মনে হয় কেন?

পৃথিবী আকারে খুব বড়। পৃথিবীর খুব সামান্য একটা অংশ আমরা দেখতে পাই। খুব বড় গোলাকার জায়গার মধ্যে অল্প একটু জায়গাকে আমরা দেখতে পাই বলেই পৃথিবীকে সমতল বলে মনে হয়।

## পৃথিবীর কটি গোলার্ধ আছে?

আমরা যে পৃথিবীর বুকে বাস করি, তাকে বিজ্ঞানীরা দুটো সমান ভাগে ভাগ করেছেন। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর মাঝ-বরাবর একটা কল্পনার দাগ কাটলেন। এই দাগ কাটার ফলে পৃথিবী দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এই দুটো ভাগ পৃথিবীর দুই গোলার্ধ, উপরের দিকটা উত্তর গোলার্ধ আর নিচের দিকটা দক্ষিণ গোলার্ধ। আমরা বাংলাদেশিরা উত্তর গোলার্ধের মানুষ।

## পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু কোথায় অবস্থিত?

পৃথিবী তার উত্তর আর দক্ষিণ দিক দিয়ে কল্পনায় টানা যে অক্ষরেখা বরাবর পরিভ্রমণ করে চলেছে, সেই অক্ষরেখা পৃথিবীকে উত্তর দিকে ছেদ করছে একটা বিন্দু দিয়ে। সেই বিন্দুটা উত্তর মেরু। সেরকমভাবে কল্পনায় টানা অক্ষরেখা পৃথিবীকে দক্ষিণ দিকেও একটা বিন্দুতে ছেদ করছে। সেই বিন্দুটা দক্ষিণ মেরু। অক্ষরেখা কল্পনায় আঁকা, কিন্তু মেরু দুটো কল্পনার নয়। তা আছে পৃথিবীর বুকেই।

## পৃথিবীর বিষুবরেখা কোনটি?

পৃথিবীর দুটি গোলার্ধ, উত্তরে উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণে দক্ষিণ গোলার্ধ। পৃথিবীর বুকে কল্পনায় আঁকা যে গোল রেখা বরাবর এই দুটি গোলার্ধ সমান দু'ভাগে বিভক্ত, সেই রেখাটাই বিষুবরেখা। বিষুবরেখা ভূ-গোলকের মাঝখান দিয়ে গেছে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর। বিষুবরেখার অপর নাম নিরক্ষরেখা। বিষুবরেখা থেকে উত্তর মেরু যতটা দূরে আছে, দক্ষিণ মেরু আছে ঠিক ততটা দূরে। উত্তর গোলার্ধের মানুষ আমরা, আমরা আছি বিষুবরেখার উত্তর দিকে।

## মূল মধ্যরেখা কাকে বলে?

ভূ-গোলকের উপরে উত্তর-দক্ষিণে সোজাসুজি একটা রেখা কল্পনা করা হয়েছে। রেখাটির নাম মূল মধ্যরেখা। এই রেখাকে ধরেই পৃথিবীতে সময়ের হিসেব শুরু। বিষুব রেখা গেছে পূর্ব-পশ্চিমে, মূল মধ্যরেখা উত্তর-দক্ষিণে। এই রেখাটাও বিষুবরেখার মতো পৃথিবীকে দুটো গোলার্ধে ভাগ করে। রেখাটার পুবদিকের অংশকে পূর্ব গোলার্ধ আর পশ্চিম দিকের অংশকে পশ্চিম গোলার্ধ বলা হয়।

## পৃথিবী তার কক্ষপথের উপরে কেমন ভাবে আছে?

অলিম্পিক গেমসে ৫০০ মিটার দৌড়ানোর পথ গোলাকার। ওই পথের উপরে এ্যাথলেটরা প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তখন মেরুদণ্ড থাকে সোজা। কিন্তু পৃথিবী যে কক্ষপথে সূর্যের চারদিক দিয়ে ঘুরে আসে বছরে একবার, সেই পথের উপরে পৃথিবীর মেরুদণ্ড তার অক্ষরেখা। তা আছে কিছুটা বাঁকা হয়ে। আমরা যখন পথ চলি, তখন আমরা মেরুদণ্ড সোজা রাখি। পৃথিবী তার অক্ষরেখা সোজা রেখে পথ চলে না। পাক দেয়া পথের উপরে তার অক্ষরেখা একটু হেলে থাকে।

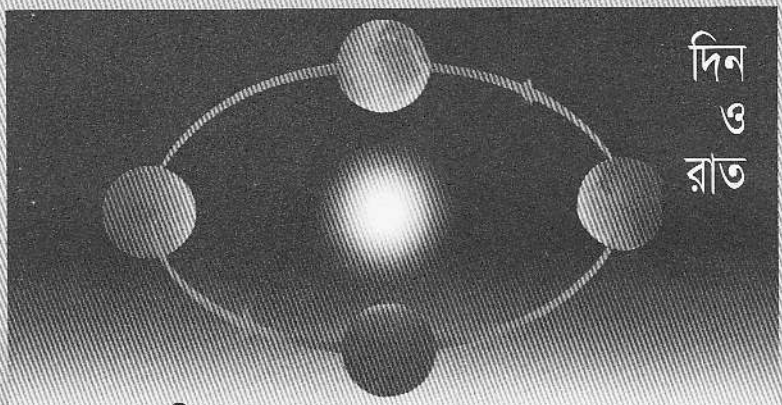

# দিন ও রাত

## বছরে কবে দিন-রাত সমান?

সূর্যকে পরিভ্রমণ করা পথের উপরে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণ গোলার্ধ দুই-ই সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে বছরে দুবার—একবার ২১ মার্চ আর একবার ২৩ সেপ্টেম্বর। দুটো গোলার্ধ যদি সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে, তাহলে দুই গোলার্ধে দিন-রাত সমান হওয়ার কথা। সত্যি সত্যিই এই দুই তারিখে দুই গোলার্ধে দিন আর রাত সমান থাকে।

খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে ওই দুই তারিখের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের হিসেব লিখে নিয়ে হিসেব কষলে দেখা যাবে দিনের দৈর্ঘ্য রাতের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে। তারপর উত্তর গোলার্ধে রোজ একটু একটু করে দিন বাড়বে আর রাত ছোট হবে। তেমনি দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক এর উল্টো।

## উত্তর গোলার্ধে কোন দিন সবচেয়ে বড়?

বড়দিনের সঙ্গে বড় কথাটা যোগ করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে যে, বড়দিনটাই সবার চেয়ে বড়। কিন্তু বড়দিন কি সত্যিই বড়? আমরা জানি, ২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টানদের বড়দিনের উৎসব। ডিসেম্বরের ওই সময়টাতে উত্তর গোলার্ধে দিন খুব ছোট হয়। তাহলে তখন বড়দিনের উৎসব করা হয় কেন? আসলে প্রায় ওই সময় থেকে এক এক করে দিন পার হয়, আর উত্তর গোলার্ধে ক্রমে দিনের দৈর্ঘ্য বড় হতে শুরু করে। এভাবে দিন বড় হতে হতে উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন আসে প্রায় ২১ জুন। তারপর আবার দিন ছোট হওয়ার পালা। আর ডিসেম্বরের প্রায় ২১ তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিন হয়ে যায় সবচেয়ে ছোট। ডিসেম্বরের ২১ তারিখের পরে অবস্থা আবার বদলায়। ছোটদিনের পরে আবার দিন বড় হওয়া শুরু। আর ওই যে দিন বড় হওয়ার সময় এল ২১ ডিসেম্বরের পরে, তা থেকেই বড়দিনের উৎসব।

## শীতকালে দিন ছোট কেন?

পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে আর দক্ষিণ গোলার্ধ সবচেয়ে কাছে আসে প্রায় ২১ ডিসেম্বর। সেজন্যে উত্তর গোলার্ধে তখন শীতকাল আর দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। আমরা উত্তর গোলার্ধে থাকি বলে ওই সময় আমরা চারপাশে শীতের আমেজ পাই, তখন গায়ে গরম জামা না পরলে চলে না। ওই অবস্থায় কিন্তু পৃথিবী নিজের অক্ষের উপরে পাক দিয়ে যাচ্ছে ২৪ ঘণ্টায় একবার। কিন্তু উত্তর গোলার্ধটা সূর্য থেকে দূরে থাকার জন্যে সূর্যের সামনে যে অংশটা আসে তার ভাগটা অন্ধকারে থাকা ভাগের চেয়ে অনেক কম। তাহলে পৃথিবীর পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আলোর মধ্যে কোনো অঞ্চল যতক্ষণ থাকবে, অন্ধকারে থাকবে তার চেয়ে বেশি সময়। আমি যেখানে থাকি, সেখানেও তাহলে ওইরকমই হবে। দিনের আলো থাকবে যতক্ষণ, রাতের অন্ধকার পাওয়া যাবে তার চেয়ে বেশি সময়ের জন্য। উত্তর গোলার্ধ যতদিন দক্ষিণ গোলার্ধের চেয়ে সূর্য থেকে দূরে থাকে, ততদিনই উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট।

## গ্রীষ্মকালে দিন বড় কেন?

পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে আর দক্ষিণ গোলার্ধ সবচেয়ে দূরে থাকে প্রায় ২১ জুন। সেজন্যে উত্তর গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল আর দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল। আমাদের দেশ উত্তর গোলার্ধে, আমরা উত্তর গোলার্ধের মানুষ। সেজন্যে জুন মাসে খুব গরম। কিন্তু সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী যেখানেই থাকুক, যেভাবেই থাকুক না কেন, নিয়ম করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার দিন আসছে, একবার রাত। কিন্তু ওই সময় উত্তর গোলার্ধটা সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকার জন্যে, উত্তর গোলার্ধে সূর্যের আলোয় থাকা অংশ, অন্ধকার অংশের চেয়ে বেশি। তাহলে পৃথিবীর পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর গোলার্ধের কোনো একটা জায়গা দিনের আলোয় যতক্ষণ থাকবে, অন্ধকারে নিশ্চয়ই ততক্ষণ থাকবে না। এজন্যে গ্রীষ্মকালে দিন বড়। উত্তর গোলার্ধ যতদিন দক্ষিণ গোলার্ধের চেয়ে সূর্যের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকবে, ততদিনই উত্তর গোলার্ধে দিন বড়।

## শীতকালে শীত ও গ্রীষ্মকালে গরম কেন?

পৃথিবী যেমন তার নিজ অক্ষকে ঘিরে পরিভ্রমণ করে তেমনি একই সঙ্গে সে সূর্যের চারদিকও পরিভ্রমণ করতে থাকে। এই পরিভ্রমণের পথের উপরে পৃথিবী সোজা থাকে না। পৃথিবীর অক্ষরেখা তার কক্ষপথে কিছুটা হেলে থাকার জন্যে কখনো পৃথিবীর উত্তর ভাগ সূর্যের দিকে বেশি হেলে থাকে, কখনো দক্ষিণ ভাগ। যখন যে অংশ সূর্যের দিকে হেলে থাকে, তখন সেদিকে গরম তো বেশি হবেই। আর অন্য দিকটায় ঠাণ্ডা। আমরা উত্তর গোলার্ধের মানুষ। আমাদের গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকে। আর শীতকালে দক্ষিণ গোলার্ধ। আমাদের দেশে মে, জুন মাসে খুব বেশি গরম আর ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাসে খুব শীত পড়ে।

## সারা বছরই কেন শীত অথবা সারা বছরই কেন গরম থাকে না?

আমাদের ঋতুচক্রে আছে গ্রীস্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এক এক সময়ে এক এক ঋতু আসে। গ্রীষ্ম আসে, শীতও আসে। কিন্তু সারা বছর কেন শীত থাকে না বা বছর জুড়ে কেন গরম থাকে না? কেন বসন্ত আসে মার্চ মাসে বা এপ্রিলের শুরুতে। সেপ্টেম্বর আর অক্টোবরেও আবহাওয়া একই রকম থাকে। শরৎকালের সময় সেটা। আসলে এরকম সময় সূর্য থেকে দুই গোলার্ধের দূরত্ব সমান। পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ–দুটি গোলার্ধই থাকে সূর্য থেকে সমান দূরে বছরে দুবার। আর একবার করে উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের খুব কাছাকাছি আসে। ২১ মার্চ আর ২৩ সেপ্টেম্বর উত্তর আর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। আর ২১ জুন উত্তর গোলার্ধ সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি আসে। অর্থাৎ সূর্য তখন মাথার উপর। উত্তর গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। আর ২১ ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে। ফলে সেখানে সূর্যের কিরণ অনেকটা হেলে পড়ে। সেজন্যে উত্তর গোলার্ধে তখন শীতকাল। পৃথিবীর পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাও বদলাতে থাকে। এভাবে শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ-বসন্তের পালাবদল চলে।

# পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল

## বায়ুমণ্ডল কাকে বলে? পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপাদান কি কি?

পৃথিবীকে ঘিরে যে বাতাসের চাদর ছড়িয়ে আছে তাই হল বায়ুমণ্ডল। কিন্তু বায়ুমণ্ডল বলতে শুধু পৃথিবীর কথা আসে না, যে গ্যাসের চাদর ঘিরে থাকে গ্রহ, উপগ্রহ আর তারাকে, তাদের সবার কথাই এসে পড়ে। মহাকাশযান আকাশে পাড়ি দেওয়ার পরে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে অনেক কথাই বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন।

পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুমণ্ডল ছড়িয়ে আছে, তার বেশির ভাগটাই নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন। বায়ুমণ্ডলের ১০০ ভাগের ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন আর ২১ ভাগ অক্সিজেন। আর বাকি ১ ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস।

## পৃথিবীকে ঘিরে বাতাস কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে?

পৃথিবীকে ঘিরে যে বাতাসের চাদর রয়েছে তা উপর দিকে ছড়িয়ে আছে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার। তবে কিছুটা উপরে উঠলেই আমাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আমরা হাঁপিয়ে পড়ি। এভারেস্টের চূড়া মাত্র নয় কিলোমিটার উঁচু। কিন্তু সেখানেও যাঁরা যাবার চেষ্টা করেন, তাঁরা সিলিন্ডারে অক্সিজেন ভরে নিয়ে যান। অর্থাৎ নয় দশ কিলোমিটার উপরে আর অক্সিজেন পাওয়া যায় না।

## মহাকাশ কাকে বলে?

আমাদের চারপাশের আবহমণ্ডল নিয়ে পৃথিবী। সেই পৃথিবীর বুকে পা রেখে আমরা ঊর্ধ্বলোকে তাকাই। সেখানে আছে সূর্য আর সূর্যকে ঘিরে গ্রহ-উপগ্রহের একটা পরিবার। সব তারকার পরিবার নেই। এসব গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ নিয়ে আমাদের আবহমণ্ডল বাদ দিয়ে যে বিপুল শূন্যতা ছড়িয়ে আছে, তাই হলো আমাদের মহাকাশ।

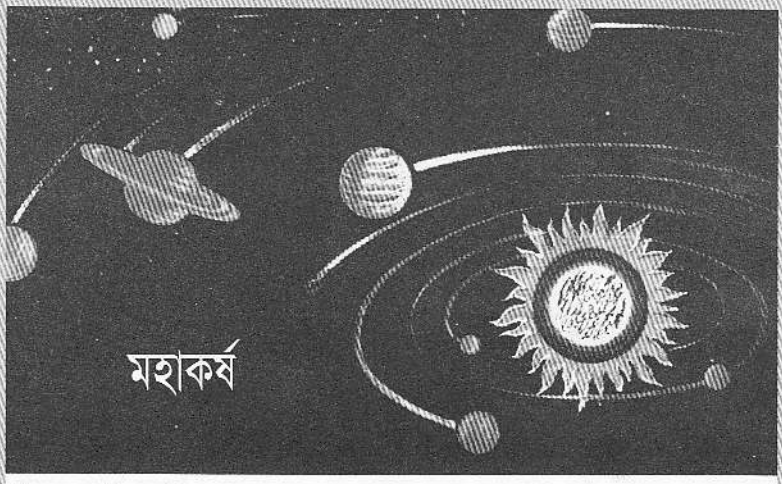


## চাঁদকে ঘিরে কি কোনো বাতাসের চাদর আছে?

বাতাসের চাদর, তার মানে বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীকে ঘিরে যেমন বায়ুমণ্ডল আছে, তেমনি চাঁদকে ঘিরেও নিশ্চয় বায়ুমণ্ডল থাকার কথা। সত্যি কথা বলতে কি এককালে চাঁদে যদি বায়ুমণ্ডল থেকেও থাকে, আজ আর চাঁদে কোথাও তা পাওয়া যাবে না। আসলে সব কিছুকেই ধরে রাখে মহাকর্ষ। আনন্দে মাটি থেকে লাফ দিয়ে উঠলেও আমরা আবার মাটিতে এসে পড়ি। কেন? তা ওই মহাকর্ষের জন্যে। মহাকর্ষ কম হলে আমরা আরও বেশি লাফ দিতে পারতাম। বেশি হলে ওইটুকু লাফাতেও কষ্ট হত। মহাকর্ষই যেন আমাদের ভালোবাসার বাঁধনে বেধে রাখে। চাঁদের মহাকর্ষের সে জোর নেই, যাতে সে তার বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখতে পারে। যদি বা কখনো সে জোর থেকেও থাকে, আজ তা মহাশূন্যে হারিয়ে গেছে।

## মহাকর্ষ কাকে বলে?

এই ব্রহ্মাণ্ডে যত বস্তু আছে, তাদের সবাই একে অন্যকে আকর্ষণ করছে। পৃথিবী আকর্ষণ করছে চাঁদকে, চাঁদ পৃথিবীকে। কেউ কোথাও বাদ পড়ে যায়নি। ভাবলে অবাক হওয়ার কথা। কিন্তু সত্যিই তাই। আকর্ষণ চলেছে যে কোনো দুটি বস্তুর পরস্পরের মধ্যে। ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে এই আকর্ষণের নাম মহাকর্ষ। গ্রহরা যে সূর্যের চারপাশে তাদের আপন আপন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়, তা এই মহাকর্ষের জন্যে। আবার পৃথিবীর আকর্ষণে চাঁদও নিজের কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খায়।

# জোয়ার-ভাঁটা

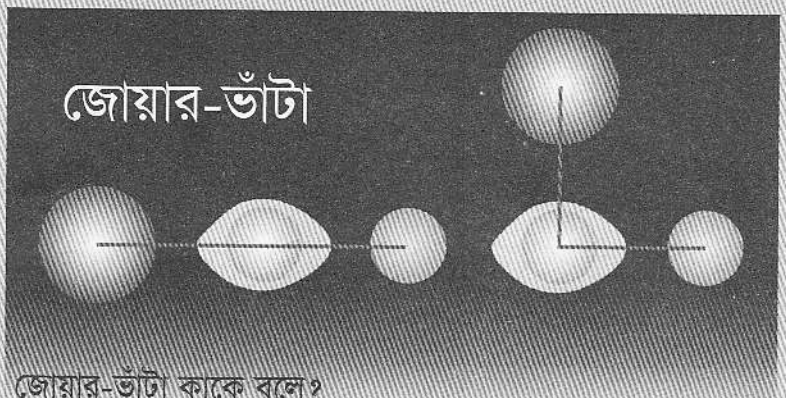

## জোয়ার-ভাঁটা কাকে বলে?

নদীতে, সাগরে কখনো কখনো পানি বেড়ে যায়। ফুলে, ফেঁপে সাগর বা নদীর চেহারা তখন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আবার এক সময় সেই ফুলে-ওঠা পানি নেমে যায়, তখন সাধারণ এক চেহারায় তা ফিরে আসে। প্রতিদিন নিয়মিত সাগরে নদীতে পানির এই বেড়ে-ওঠাকে জোয়ার, আর কমে-আসাকে ভাঁটা বলে—দুইয়ে মিলে জোয়ার-ভাঁটা। একটা পুরো দিনে বা প্রায় ২৪ ঘণ্টায় একই জায়গায় দুবার জোয়ার আসে, সেই সঙ্গে দুবার ভাঁটা।

## জোয়ার-ভাঁটার কারণ কি?

মহাবিশ্বে সবাই একে অন্যকে আকর্ষণ করছে। সূর্য টানছে পৃথিবীকে। চাঁদেরও টান রয়েছে। সেই টানটা আমরা দেখতে পাই আমাদের বিপুল জলরাশির উপরে। আমাদের পৃথিবীর মাত্র একভাগ স্থল তিনভাগ পানি। ফলে চাঁদ আর সূর্যের মিলিত টানে সেখানে জোয়ার-ভাঁটা হয়। তবে সূর্যের চেয়ে চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে বলেই জোয়ার-ভাঁটার সময় চাঁদের প্রভাবটাই বেশি।

## মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ার কাকে বলে?

জোয়ার-ভাঁটার বেলায় চাঁদের প্রভাবটাই পৃথিবীর উপরে বেশি পড়ে বলে আপন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর যে-অংশটা চাঁদের কাছে আসে, সেই অংশের উপরে চাঁদের আকর্ষণ খুব বেশি থাকে। সেজন্যে তখন পৃথিবীর অন্য অংশ থেকে পানি এসে ওখানে জমা হয়। সে সময় ওই অঞ্চলটাতে যে জোয়ার দেখা দেয়, তাকে মুখ্য জোয়ার বলে। তাহলে চাঁদের আকর্ষণের দিকে মুখ্য জোয়ার হলে বিপরীত দিকে চাঁদের আকর্ষণ কম থাকবে বলে সেখানকার জোয়ার হবে গৌণ জোয়ার। মুখ্য আর গৌণ জোয়ারের নাম থেকেই তাদের ধরনটা বোঝা যায়। মুখ্য অর্থ প্রধান আর গৌণ অর্থ অপ্রধান অর্থাৎ যা প্রধান নয়।

# ভরা জোয়ার মরা জোয়ার

## ভরা জোয়ার ও মরা জোয়ার কাকে বলে?

প্রতিদিন জোয়ার এক রকমের হয় না। এক একদিন দেখা যায়, জোয়ারের সময় পানি ফুলে-ফেঁপে ওঠে অনেক বেশি।

### ভরা জোয়ার

অমাবস্যার দিনে পৃথিবীর একই দিকে থাকে চাঁদ আর সূর্য, অর্থাৎ চাঁদ ঘুরতে ঘুরতে সে সময় পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে আসে। ফলে ওইদিন একই দিক থেকে চাঁদ আর সূর্য সাগরের পানিকে টান দেয়। পূর্ণিমার দিন আবার পৃথিবীর একদিকে থাকে চাঁদ আর একদিকে সূর্য অর্থাৎ পৃথিবী সে সময় থাকে চাঁদ আর সূর্যের মাঝখানে। তখন বিপরীত দিক থেকে চাঁদ আর সূর্য সাগরের পানিকে টানে। ফলে অমাবস্যা আর পূর্ণিমা দু'দিনেই জোয়ার হয় খুব বেশি। এই দু'দিনের জোয়ারকে বলা হয় ভরা জোয়ার বা ভরা কোটাল।

### মরা জোয়ার

অমাবস্যা আর পূর্ণিমার মাঝামাঝি সময়ে সপ্তমী, অষ্টমী তিথিতে পৃথিবী আর সূর্য যে রেখায় থাকে, চাঁদ সেই রেখার উপরে থাকে না। পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ তখন থাকে পৃথিবী আর সূর্যের রেখার সঙ্গে প্রায় নব্বুই ডিগ্রি কোণ করে। সে সময়ে চাঁদের টান সাগরের পানিকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু কোণাকুণি সূর্যের টান আবার ওই জায়গার পানিকে নামিয়ে দিতে চায়। ফলে জোয়ারটা তেমন বেশি হতে পারে না। এই জোয়ারকে মরা জোয়ার বা মরা কোটাল বলে।

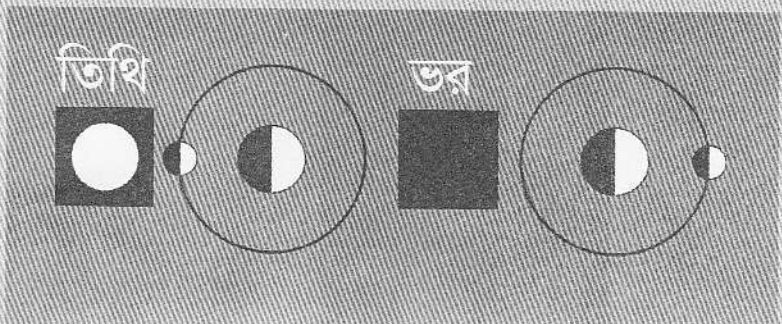


## তিথি কি? অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মধ্যে ব্যবধান কত?

অমাবস্যার রাতে আকাশে চাঁদ থাকে না, চারপাশে ঘোর অন্ধকার। এই অমাবস্যাকে আমরা বলি একটা তিথি। অমবস্যা তিথি। পূর্ণিমার সময় আবার চারদিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যায়। অমাবস্যার মতো পূর্ণিমা আর একটা তিথি। একটা পূর্ণিমা থেকে পরের পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান সাড়ে ২৯ দিন। পরপর দুটো অমাবস্যার মধ্যেও সময়ের ব্যবধান একই। যেহেতু ক্যালেন্ডারে সাড়ে ২৯ দিন পাওয়া যায় না। তাই পরপর দুটো পূর্ণিমা বা অমাবস্যার মধ্যে সময়কাল ধরে কখনো বা ২৯ দিন, কখনো আবার ৩০ দিন। অমাবস্যার পরে এক ফালি চাঁদ আকাশে দেখা যায়, রোজ তা বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমার দিন আকাশে গোল চাঁদ ফুটে ওঠে। অমাবস্যার পরে আসে প্রতিপদ তিথি, তারপর দ্বিতীয়া, তৃতীয়া–এভাবে চতুর্দশী তিথির পরে আসে পূর্ণিমা তিথি। একইভাবে পূর্ণিমার পর থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে আবার পনেরোটি তিথি। এক একটা তিথি প্রায় এক একদিনের সমান।

## ভর কাকে বলে? ভর কি বদলায়

দু চামচ লবণ বা কয়েক ফোঁটা ওষুধ, বাতাস ভরা বেলুন বা আকাশে ওড়ানো ঘুড়ি—যে কোনো জিনিস হতে পারে। এই যে কোনো জিনিসে যে পরিমাণ পদার্থ থাকে, তাকে ওই জিনিসটার ভর বলে। যে কোনো জিনিসই হোক, তার ভর সব সময় একই থাকে। জিনিসটাতে যে পরিমাণ পদার্থ আছে, তা তো বদলাতে পারে না। তাহলে ভর বদলাবে কেমন করে? পৃথিবীর বুকে কোনো জিনিসের ভর যা, চাঁদের বুকেও তাই। সূর্যেও তা একই থাকবে।

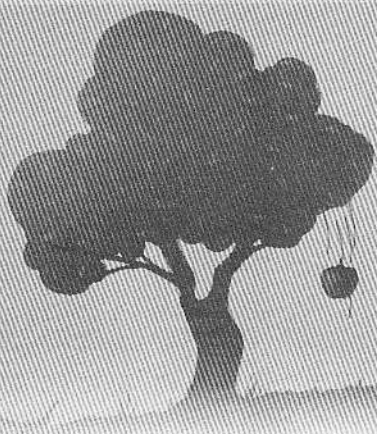

# ওজন ও মাধ্যাকর্ষণ

## ওজন কাকে বলে? ভর আর ওজন কি এক? ওজন কি বদলায়?

পৃথিবী তো সব জিনিসকেই নিজের দিকে টানছে। কোনো জিনিসকে পৃথিবী যেভাবে টানছে, সেটাই জিনিসটার ওজন। ওজন আর ভর এক নয়। ভর বদলায় না, ওজন কিন্তু বদলে যেতে পারে। বস্তুর উপরে পৃথিবীর যে টান, সেই টানটার যদি পার্থক্য ঘটে, তাহলে ওজনও আর এক থাকবে না। পৃথিবীটা এমন যে তার সব জায়গার টান এক রকম নয়। ফলে, ওজনও বদলায়।

## মাধ্যাকর্ষণ কাকে বলে? গাছের আপেল মাটিতে পড়ে কেন?

আমাদের পৃথিবী সব বস্তুকেই নিজের দিকে অর্থাৎ মাটির দিকে টানছে। এ জন্যেই এক লাফে আমরা পৃথিবীর টান এড়িয়ে আকাশে হারিয়ে যেতে পারি না। যত জোরে লাফ দিই না কেন, ঠিক ফিরে এসে আছড়ে পড়ি মাটির উপরে। তাই গাছ থেকে ফল-ফুল খসে পড়লে আকাশে উঠে যায় না, পড়ে মাটিতে। উঁচু করে বল মারলেও নেমে আসে পায়ের কাছে। এভাবে পৃথিবী সব বস্তুকেই নিজের দিকে টেনে রাখে। যে বল বা শক্তির জোরে পৃথিবী সব বস্তুকে মাটির দিকে আকর্ষণ করে তাকে বলে মাধ্যাকর্ষণ। আর এই মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গাছের আপেলও গাছ থেকে খসে গেলে মাটিতে এসে পড়ে।

## ভিজে মাটিতে হাঁটতে অসুবিধা হয় কেন?

বর্ষা-বাদলে আমাদের অনেক সময় ভিজে মাটিতে হাঁটতে অসুবিধা হয়। কিন্তু কেন? আসলে আমাদের দেহটাকে পৃথিবী টানছে তার নিজের দিকে। সেই টানেই আমাদের পা বসে যাচ্ছে কাদার উপরে বা ভিজে মাটিতে। দাগ পড়ে যাচ্ছে সেখানে। হাঁটতে তাই অসুবিধা হচ্ছে।

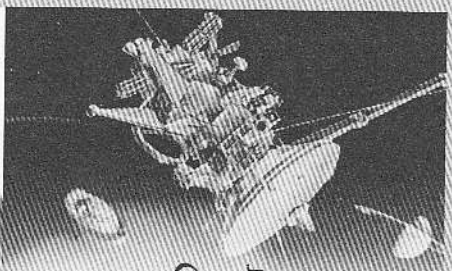

## চাঁদে মানুষের ওজন

## কৃত্রিম উপগ্রহ

### চাঁদে মানুষের ওজন কত?

ধরা যাক পৃথিবীতে একজন মানুষের ওজন ৪০ কেজি। এই ওজন নিয়ে যদি সে চাঁদের বুকে গিয়ে ওজন মাপে, তাহলে তার ওজন কত হবে? কোনো বস্তুর উপরে চাঁদের টান পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম, পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। আর এই টানের উপরে আমাদের ওজন নির্ভর করে বলে পৃথিবীতে যার ওজন ৪০ কেজির মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ ৭ কিলোগ্রাম মাত্র।

### কৃত্রিম উপগ্রহ কাকে বলে?

পৃথিবী একটা গ্রহ। চাঁদ কিন্তু একটা উপগ্রহ। পৃথিবীর উপগ্রহ। কারণ চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। এই চাঁদটাকে মানুষ ঘরে বসে তৈরি করে পৃথিবীর চারপশে ঘোরার জন্যে আকাশে পাঠিয়ে দেয়নি। তাই এটা স্বাভাবিক উপগ্রহ। বিজ্ঞানীরা কিন্তু এমন সব বস্তু তৈরি করে আকাশে পাঠান, যারা হয় পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে যাচ্ছে, না হলে চাঁদকে বা অন্য কোনো মহাকাশীয় বস্তুকে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। এরা সবাই এক-একটা কৃত্রিম উপগ্রহ। বৃহস্পতি বা শনির উপগ্রহদের মতো স্বাভাবিক নয় বলেই এরা কৃত্রিম। এই সব উপগ্রহ তৈরি করতে অনেক খরচ ও সময় লাগে, যদিও এরা আমাদের নানা উপকারে আসে।

## পদার্থ

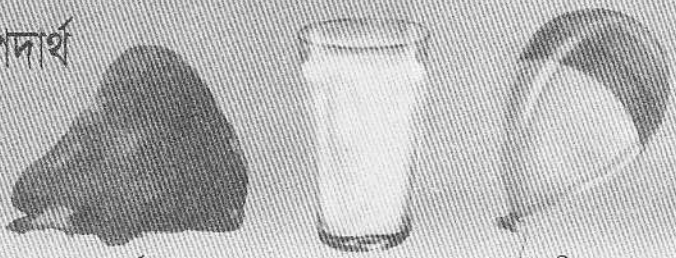

কঠিন তরল বায়বীয়

### পদার্থ কি ও কত প্রকার?

আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখি অর্থাৎ যার নিজের আকার ও আকৃতি আছে তাই পদার্থ। সব পদার্থ এক রকমের নয়। কোনোটা কঠিন, কোনোটা তরল, কোনোটা আবার বায়বীয়। বিজ্ঞানীরা পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—কঠিন, তরল আর বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থ।

**কঠিন পদার্থ :** কঠিন পদার্থের আকার আছে। এক জায়গায় রেখে দিলে স্থির থাকে। ছড়িয়ে পড়ে না। মাটি, পাথর কঠিন পদার্থ।

**তরল পদার্থ :** তরল পদার্থের নিজের কোনো আকার নেই। তাকে যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। দুধ বা পানি গ্লাসে রাখলে তা গ্লাসের আকার নেয় আবার বাটিতে রাখলে তার আকার তখন বাটির মতো। দুধ বা পানি তরল পদার্থ।

**বায়বীয় পদার্থ :** বাতাসেরও নিজের কোনো আকার নেই। সে রকম বিভিন্ন গ্যাসেরও নিজস্ব কোনো আকার থাকে না। এরা গ্যাসীয় বা বায়বীয় পদার্থ। বায়ু থেকে বায়বীয় কথাটা এসেছে আর গ্যাসীয় কথাটা এসেছে গ্যাস থেকে। বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থকে কোনো কিছুতে ভরে বেঁধে রাখতে হয়। না হলে তা ছড়িয়ে যায়। বেলুনে গ্যাস ভরে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখি। তখন বেলুনে ভরা গ্যাস থাকে বেলুনের আকারে।

### বাতাস, পানি, মাটি কি একই রকমের পদার্থ?

বাতাস, পানি, মাটি সবই জড় পদার্থ। এদের কারোরই প্রাণ নেই। তবে জড় পদার্থ হলেও এরা সবাই এক রকমের নয়। বরং তিনটি পদার্থ তিন রকমের। পানি তরল, বাতাস বায়বীয় আর মাটি কঠিন। এর মধ্যে মাটি ও পানিকে আমরা দেখতে পাই। কেবল বাতাসকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু যখন গাছের পাতা নড়ে, খোলা বইয়ের পাতা উল্টে যায়, ছাদে মেলা কাপড় উড়তে আরম্ভ করে তখন চোখে দেখতে না পেলেও বাতাস যে আছে তা অনুভব করা যায়। তখন বোঝা যায়, বাতাসের কত শক্তি।

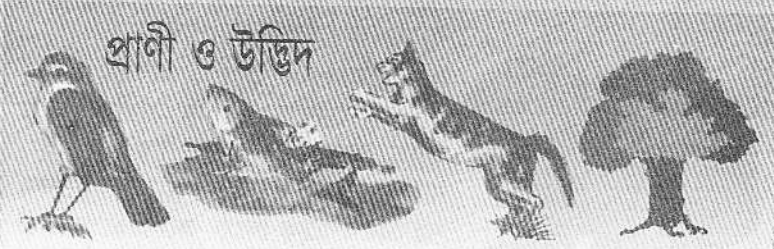


## জীবনের লক্ষণ কি? জীবন আছে কিভাবে বোঝা যাবে?

জীবনের লক্ষণ উত্তেজনায় সাড়া দেয়া। ধরা যাক, দূরে একটা সাপের মতো কিছু শুয়ে আছে। এখন যদি দূর থেকে একটা ইট ছোঁড়া যায় ওটার দিকে তাহলে দেখা যাবে যদি সাপ হয় তাহলে নড়েচড়ে উঠবে। আর যদি সাপ না হয়ে একটা দড়ি হয়ে থাকে তাহলে তা যেমন ছিল, তেমনই পড়ে থাকবে। নির্জীব জড় পদার্থ উত্তেজনায় সাড়া দেয় না। তাছাড়া জীবন্ত প্রাণী তার দেহের পুষ্টি আর শরীরের শক্তি যোগাড় করার জন্যে খাদ্য খায়। জীব বায়ু থেকেও খাবারের উপাদান নিতে পারে। তাছাড়া প্রতিটি জীবকেই বাঁচার জন্যে শ্বাস গ্রহণ করতে হয়। আসলে শ্বাস গ্রহণ থেকেই সে তার বাঁচার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগাড় করে থাকে। খাদ্য গ্রহণ যেমন, শ্বাস নেওয়াও তেমনি জীবনের লক্ষণ। আর যার জীবন আছে সে বংশবিস্তার করে থাকে। জড় পদার্থের কিন্তু সে ক্ষমতা নেই।

## প্রাণ আছে তবুও সব প্রাণী কি এক রকমের? প্রাণী কারা? উদ্ভিদ কাকে বলে?

আমাদের চারপাশে আমরা যত জীবিত বস্তু দেখতে পাই, তারা সবাই এক রকমের নয়। কেউ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নড়েচড়ে বেড়ায়। পোষা বেড়ালটা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘোরে। পাখি ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, মাছ পানিতে খেলা করে—এরা সবাই প্রাণী।

আর এক রকম সজীব বস্তু আছে যারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলাফেরা করতে পারে না। এরা উদ্ভিদ। বাগানের আমগাছ, টবের বেলফুল, মাচার লাউ-কুমড়ো—এরা সবাই উদ্ভিদ, ডালপালায় এরা বেড়ে ওঠে। সাধারণত উদ্ভিদের ডালপালা, কচিপাতা সবুজ রঙের। কিন্তু প্রাণিদের কোনো নির্দিষ্ট রঙ নেই। এক এক প্রাণি এক এক রঙের হয়ে থাকে। উদ্ভিদের মধ্যে ব্যাঙের ছাতারও অনেক রঙ হতে পারে, তবে তা কখনো সবুজ হয় না।

## ব্যাঙ কি মেরুদণ্ডী প্রাণী?

মেরুদণ্ডী প্রাণি

ব্যাঙ মেরুদণ্ডী প্রাণী। আমরা জানি, কোনো কোনো প্রাণীর শরীরে হাড় আছে, আবার কোনো প্রাণীর তা নেই। যাদের শরীরে হাড় আছে, তাদের শরীরের পিঠের দিকে অনেকগুলো হাড় মাথা থেকে পিছন পর্যন্ত এক সারিতে সাজানো থাকে। একেই বলে মেরুদণ্ড। যাদের মেরুদণ্ড আছে, তারা সবাই মেরুদণ্ডী প্রাণী। মেরুদণ্ডকে চলতি কথায় বলা হয় শিরদাঁড়া। আমাদের পিঠে হাত দিলে আমরা মেরুদণ্ড খুঁজে পাই। তাহলে আমরা মেরুদণ্ডী প্রাণী। আমাদের মতো গরু, ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল, ছাগল, সাপ, টিকটিকি, মাছ, পাখি সবাই মেরুদণ্ডী প্রাণী।

## শামুক কি ধরনের প্রাণী?

শামুক অমেরুদণ্ডী প্রাণী। আমাদের মতো অনেক প্রাণীর যেমন মেরুদণ্ড আছে, তেমনি আবার মেরুদণ্ড নেই, এমন প্রাণীরও অভাব নেই। যে সব প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই, তাদের বলা হয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী। আমাদের চারপাশেই অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণী দেখতে পাই। পিঁপড়ে একটা অমেরুদণ্ডী প্রাণী। পিঁপড়ের মতো মশা, মাছি, ফড়িং, মৌমাছি, প্রজাপতি, কৃমি, কেঁচো, জোঁক, চিংড়ি, কাঁকড়া, মাকড়সা, বিছাও অমেরুদণ্ডী প্রাণী। শামুক, ঝিনুকও আর এক ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণি।

## স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী কারা?

ছোটবেলায় যে সব প্রাণীরা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়, তাদের স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে। মানুষ স্তন্যপায়ী প্রাণী। কুকুর, বেড়ালও স্তন্যপায়ী। কুকুর, বেড়াল, গরু, মানুষ সব মেরুদণ্ডী প্রাণী। তবে মেরুদণ্ডী প্রাণী হলেই যে স্তন্যপায়ী হবে তা নয়। পাখি মেরুদণ্ডী প্রাণী। ব্যাঙ ও মাছের মেরুদণ্ড আছে। কিন্তু এরা কেউ স্তন্যপায়ী নয়। এদের মায়েরা ডিম পাড়ে আর সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। এদের বলে অন্ডজ প্রাণী।

## গুইসাপ কি সরীসৃপ?

গুইসাপ সরীসৃপ। এক রকমের প্রাণী আছে যারা বুকে হেঁটে চলে। তাদের দেহটা থাকে মাটি বরাবর, আমাদের মতো মাটির উপরে দাঁড়ানো নয়। এসব প্রাণীদের শরীরটা ছোট ছোট শুকনো আঁশে ঢাকা থাকে আর এদের পা শরীরটার তুলনায় ছোট। এদের সরীসৃপ বলা হয়। আমাদের ঘরের দেয়ালে আমরা টিকটিকি দেখতে পাই। টিকটিকি একটা সরীসৃপ। টিকটিকি বুকে হেঁটে চলে। যখন সে দেয়ালে তখন তার চলাফেরা দেয়াল বরাবর, আবার মাটির উপরেও সে মাটি ধরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম আছে গিরগিটি, গুইসাপ। সাপও সরীসৃপ। সাপের অবশ্য পা নেই। সাপ বুকে হাঁটে। পানিতে বাস করে এমন দুটি সরীসৃপের নাম কচ্ছপ ও কুমির। এরা সবাই মেরুদণ্ডী প্রাণি, কিন্তু মায়ের দুধ খেয়ে এরা বড় হয় না। অর্থাৎ এরা স্তন্যপায়ী প্রাণী নয়—ডিম ফুটে জন্ম হয় বলে এরা অন্ডজ।

## কেঁচো কি অঙ্গুরীমাল প্রাণী?

কেঁচো অঙ্গুরীমাল প্রাণী। অঙ্গুরী কথাটার অর্থ আংটি। কেঁচোকে অঙ্গুরীমাল প্রাণী বলা হয়, কারণ কেঁচোর শরীরটা অনেকগুলো আংটির মতো অংশ দিয়ে তৈরি। একটা আংটি চওড়ায় রীতিমতো সরু। কিন্তু অনেকগুলো আংটি যখন পাশাপাশি জুড়ে রাখা হয়, তখন তা লম্বায় অনেকটা জায়গা নেয়। কেঁচোর শরীর যেন অনেকগুলো আংটির জোড়।

কেঁচো এক ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণী, এরা ভেজা জায়গায় বাস করে। আমাদের চেনা অন্য একটি অঙ্গুরিমাল প্রাণী হচ্ছে জোঁক। পানিতে আর ভেজা জমিতে এদের বাস। কিছু জোঁক আবার রক্ত খায়।

## আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়

### পঞ্চ ইন্দ্রিয় কি কি? এদের কাজ কি?

বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়া জীবের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে প্রাণী যত উন্নত, তার বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেবার ক্ষমতাও তত বেশি। মানুষ সবচেয়ে উন্নত প্রাণী। তাই তার বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেবার ক্ষমতাও আর সব প্রাণীকে ছাড়িয়ে গেছে খুব। বাইরের বিভিন্ন উত্তেজনা আমরা আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করি। পঞ্চ ইন্দ্রিয় হলো চোখ, কান, নাক, জিহ্বা আর ত্বক। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, কান দিয়ে শুনি, নাক দিয়ে গন্ধ অনুভব করি, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি আর ত্বকের সাহায্যে যে বস্তুটি স্পর্শ করে সেটি সম্পর্কে আমরা ধারণা পাই।

### প্রাণীরা কি নিজের শরীরে নিজেরা খাদ্য তৈরি করতে পারে? না কি খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল?

না, প্রাণীরা নিজেদের শরীরে নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে না। মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীরা খাদ্যের ব্যাপারে উদ্ভিদের উপরেই পুরোপুরি নির্ভর করে। উদ্ভিদ যেমন তার সবুজ পাতায়, সূর্যের আলোয় মাটি থেকে শুষে নেয়া পানি আর বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে শর্করা জাতীয় খাবার তৈরি করতে পারে, প্রাণীদের নিজেদের দেহে সেইভাবে খাবার তৈরি করার ক্ষমতা নেই। খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের নির্ভর করতে হয় উদ্ভিদের উপরে। উদ্ভিদ ছাড়া প্রাণীদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই সম্ভব নয়। সে অর্থে প্রাণী ও উদ্ভিদ সহ সৃষ্টি জগতের সবকিছুই একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

# মানব দেহ একটা গাড়ির ইঞ্জিন

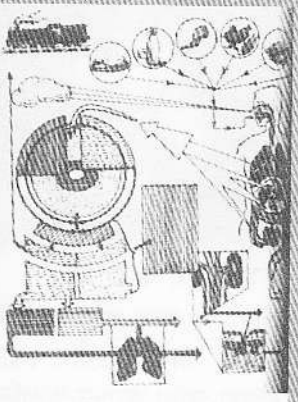

## আমাদের দেহ কি একটা ইঞ্জিনের মতো?

আমাদের দেহ ঠিক যেন একটা গাড়ির ইঞ্জিন। যে কোনো ইঞ্জিন যখন চলে তখন তার জ্বালানির দরকার। মোটরগাড়ি চালানোর জন্যে তাতে ডিজেল ভরতে হয়, না হলে পেট্রোল। বাষ্পীয় ইঞ্জিনে কয়লা ঢালতে হয় আর সেই সঙ্গে পানি। কয়লা পুড়ে যে তাপ হয়, তা পানি ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি করে। আর এভাবেই বাষ্পীয় ইঞ্জিন চলে।

আমরা আমাদের শরীরটাকে ঠিকমতো চালানোর জন্যে খাদ্য খাই, পানি পান করি। খাদ্য আমাদের কাজ করার শক্তি যোগায়, আমাদের দেহে পুষ্টি নিয়ে আসে। খাদ্য ও পানীয় আমাদের শরীরে জ্বালানির মতো। তা শরীরের মতো ইঞ্জিনটাকে সচল রাখে।

## বোন ব্যাংক কাকে বলে?

বোন ব্যাংক (Bone Bank) শব্দটা অনেকের কাছে নতুন মনে হলেও এ পদ্ধতি নতুন কিছু নয়। ব্লাড ব্যাংকে যেমন রক্ত ও আই ব্যাংকে চোখ সংরক্ষণ করে রাখা হয়, বোন ব্যাংকে তেমন হাড় সংরক্ষণ করে রাখা হয়। পরবর্তী সময় যে সব মানুষের শরীরে হাড় প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়, তারা বোন ব্যাংক থেকে হাড় সংগ্রহ করে তা কাজে লাগাতে পারে। তবে সবার শরীরে সবার হাড় মিল নাও খেতে পারে। আর হাড় প্রতিস্থাপনের আগে ওই হাড়টি যার ছিলো সে কখনো জন্ডিস, হেপাটাইটিস, সিফিলিস বা এইডস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলো কিনা, তা জেনে নেয়া প্রয়োজন।

## ফুসফুসের কাজ কি?

আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নাকের ছিদ্র দিয়ে বাইরের বাতাস শরীরে ঢোকে, তারপর শরীর থেকে আবার তা বেরিয়ে আসে। বাতাসের এই যাওয়া-আসা আপনা-আপনি ঘটে না। শরীরের ভেতরে একটা যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রটাই এই কাজ অবিরাম করে চলে। এই যন্ত্রটার নাম ফুসফুস। ফুসফুস শরীরের ভেতরে যে বাতাস টানে আর শরীর থেকে যে বাতাস বের করে দেয়—দুটো কিন্তু এক বিষয় নয়। যে বাতাস যায় আমাদের শরীরের ভেতর তা হচ্ছে অক্সিজেন, আর যে বাতাস বেরিয়ে আসে শরীর থেকে তার বেশিরভাগই কার্বন ডাই-অক্সাইড।

## রক্ত লাল কেন?

আমাদের শরীরে যে রক্ত আছে, তার রঙ লাল। হাত-পা কেটে বা ছড়ে গেলে সেই লাল রক্ত বেরিয়ে আসে শরীর থেকে। ফুসফুস থেকে অক্সিজেন নিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেয়া রক্তের একটা প্রধান কাজ। রক্তের মধ্যে আছে লোহিত কণিকা। লোহিত কণিকা অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটা করে। তাছাড়া রক্তে আছে শ্বেত কণিকাও। লোহিত কথাটার অর্থ লাল। শ্বেত কথাটার অর্থ সাদা। শ্বেত কণিকার চেয়ে রক্তে লোহিত কণিকা অনেক বেশি পরিমাণে থাকে বলেই রক্তের রঙ লাল।

## হৃৎপিণ্ড কী কাজ করে?

শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যে আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশের মধ্যে রক্তের প্রবাহ থাকা দরকার। এই কাজটা করে হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ডের কাজ অনেকটা পাম্পের মতো। পাম্পের সাহায্যে পুকুরের পানি যেমন ক্ষেতের নালার ভেতর দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি হৃৎপিণ্ডও রক্তস্রোতকে শরীরের সব অংশে ছড়িয়ে দেয়। তবে ক্ষেতের পানি আর পুকুরে ফেরে না, কিন্তু হৃৎপিণ্ড যে রক্ত শরীরের সব অংশে ছড়িয়ে দেয়, তা কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত হতে, আবার সেখান থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা যতদিন বাঁচি হৃৎপিণ্ড ততদিন এভাবে কাজ করে যায়।

# জ্বর ও থার্মোমিটার

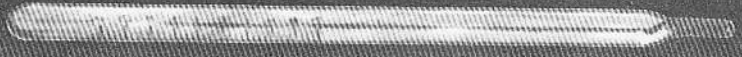

## আমাদের বুক ধড়ফড় করে কেন?

আমরা যখন খেলাধুলা করি বা সিঁড়ি ভেঙে একতলা থেকে চারতলায় উঠি তখন বুক ধড়ফড় করে, আমরা হাঁপাতে থাকি। আসলে আমরা যখন কাজ করি, তখন শরীরে বেশি পরিমাণ অক্সিজেনের দরকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত-সঞ্চালনের গতিও বেড়ে যায়। রক্ত-সঞ্চালন করে হৃৎপিণ্ড। বুকে কান পাতলে আমরা হৃৎপিণ্ডের কাজ করার ধুকপুক শব্দ শুনতে পাই। রক্ত-সঞ্চালনের গতির সাথে হৃৎপিণ্ডের গতিও বেড়ে যায়। আর এটাই হচ্ছে বুক ধড়ফড় করা।

## শরীরে জ্বর বা তাপমাত্রা কি?

শরীর গরম হলে মা কপালে হাত দিয়ে বলেন, জ্বর হয়েছে। জ্বর মানে তাপমাত্রা। কিন্তু কত জ্বর? তা মাপার জন্য দরকার থার্মোমিটার। থার্মোমিটারের গায়ে অনেক দাগ কাটা আছে। দাগকাটা থার্মোমিটার একটা স্কেলের মতো। স্কেলে আমরা দৈর্ঘ্য মাপি, থার্মোমিটার হলো গা কতটা গরম হলো তা মাপার যন্ত্র। থার্মোমিটারের মধ্যে থাকে পারদ। লোহা যেমন একটা ধাতু, তেমনি পারদও একটা ধাতু। গরমে পারদ বেড়ে গিয়ে উপরের দিকে উঠে স্কেলের গায়ে জ্বরের নির্দেশ দেয়। আমরা যখন বলি জ্বর ১০১ ডিগ্রি, তখন যে স্কেলে তা মাপা হয়, তা হল ফারেনহাইট স্কেল।

## ডাক্তাররা নাড়ি টেপার সময় ঘড়ি দেখেন কেন?

হৃদপিণ্ড আমাদের শরীরের মধ্যে রক্ত পাম্প করে। সঙ্গে সঙ্গে নাড়িরও স্পন্দন হয়। সুস্থ শরীরে নাড়ির স্পন্দন হয় প্রতি মিনিটে ৭২ বারের মতো। ডাক্তাররা নাড়ির গতি ঠিক আছে কিনা তা হিসেব করার জন্য ঘড়ি দেখেন।

## আমরা শক্তি পাই কোথা থেকে?

আমরা নানা ধরনের কাজ করি প্রতিদিন। আর এসব কাজের জন্য শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তির যোগান দেয় শরীর। আমাদের শরীরকে ঠিক রাখতে প্রয়োজন সুষম খাদ্যের। আমাদের শরীরে অবিরাম অক্সিজেনের যে সরবরাহ, বিভিন্ন খাদ্যবস্তু অক্সিজেনের সঙ্গে দহনে পুড়ে গিয়ে তাপ সৃষ্টি করে আমাদের শক্তি যোগায়।

# অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড

## বদ্ধ ঘরে থাকা অস্বাস্থ্যকর কেন?

শরীরে শক্তির জন্য আমাদের খাদ্য চাই। সেই সঙ্গে অক্সিজেনও চাই। কিন্তু ঘরের দরজা-জানালা সব যদি বন্ধ রাখা হয়, তাহলে শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে সবসময় অক্সিজেন গ্রহণ করার ফলে বদ্ধ ঘরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। আর নিঃশ্বাসে আমরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ি ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। এভাবে বদ্ধ ঘরে ক্রমাগত অক্সিজেন কমে গিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে গেলে আমাদের শরীর আর প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাই না। ফলে আমাদের শরীরে অস্বস্থি হয়। আমাদের হাঁপানি সহ নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়।

## বদ্ধ ঘরে চুলা চালিয়ে রাখা কি উচিত?

আগুন জ্বালাবার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয় আর বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যায়। সেজন্য বদ্ধ ঘরে চুলা জ্বালিয়ে রাখলে ঘরের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে আসে আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যায়।

## আমাদের শ্বাসকার্যে অক্সিজেন গ্রহণ আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ার ফলে বাতাসে কি অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে?

আমরা প্রাণীরা শ্বাসকার্যের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ি, তবে অন্যদিকে উদ্ভিদের খাবার তৈরির যে ব্যাপার তা ঠিক আমাদের উল্টো। উদ্ভিদ তার সবুজ পাতার মাধ্যমে দিনের বেলায় সূর্যকিরণে খাবার তৈরি করার সময় বাতাস থেকে প্রচুর পরিমাণে দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে নেয় আর ফিরিয়ে দেয় বিশুদ্ধ অক্সিজেন। ফলে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে না, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও বাড়ে না। বাতাস থাকে নির্মল ও স্বাভাবিক। এ জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই গাছ লাগানো উচিত।

# গাছ বা উদ্ভিদ

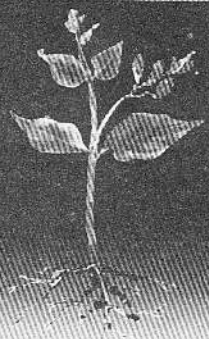

## গাছ বা উদ্ভিদের কটা অংশ?

একটি উদ্ভিদকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি।

মূল : মাটির তলায় গাছের যে অংশ অর্থাৎ যেটা গাছের শিকড় সেটা একটা ভাগ। এই ভাগের নাম মূল। এই অংশটার সঙ্গে মাটির উপরের অংশের কোনো মিল নেই। গাছের উপরের অংশটা সবুজ আর মাটির নিচের অংশটার মধ্যে সাদা বা ধূসর ভাব বেশি।

কাণ্ড : মাটির উপরে গাছের একটা সবুজ রঙের অংশ আছে। এটা হলো গাছের কাণ্ড। এটা গাছের আর একটা ভাগ।

পাতা : মূল আর কাণ্ডের পর গাছকে আর একটা ভাগে ভাগ করা যায়। কাণ্ডের সঙ্গে লেগে আছে গাছের সবুজ পাতা, কোথাও বড় বড় পাতা, কোথাও ছোট পাতা। মূল, কাণ্ড আর পাতা নিয়েই একটা উদ্ভিদ। গাছকে আরও দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—একটা হলো ফুল, আর অপরটা ফল।

## উদ্ভিদ কিভাবে খাবার তৈরি করে?

পাতার সাহায্যে গাছ খাবার তৈরি করে। আমরা খালি চোখে বুঝতে পারবো না, কিন্তু আতস কাচ দিয়ে দেখলে গেখা যাবে পাতার গায়ে অনেক ছোট ছোট ছিদ্র আছে। গুণে তা শেষ করা যায় না। এসব ছিদ্র দিয়ে গাছ বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। পাতায় ক্লোরোফিল নামে সবুজ কণা থাকে। এই ক্লোরোফিল বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর মূলের মাধ্যমে শোষণ করা পানি আর সূর্যের আলোর সাহায্যে গাছ তার খাবার তৈরি করে। তাকে সালোক-সংশ্লেষণ বলা হয়। গাছের খাবার হলো শর্করা জাতীয় খাদ্য।

## বীজের অঙ্কুর বের হওয়ার জন্যে কি কি চাই?

বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য চাই পানি আর বাতাস আর সূর্যের আলো। বাতাসের অভাবে যেমন প্রাণি বাঁচে না, তেমনি উদ্ভিদও বাঁচে না। শীতকালে এসব উপাদান ঠিকমতো পায় না বলে অঙ্কুরোদগম কম হয়।

# বৃক্ষরোপণ

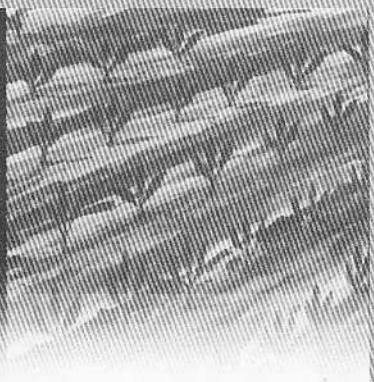

## বৃক্ষরোপন কেন দরকার?

গাছ আমাদের শুধু ফুল, ফল বা কাঠ দিয়ে সাহায্য করে এমন নয়। গাছ নানাভাবে আমাদের উপকারে আসে। একটা বড় গাছ সারাজীবনে যতটা অক্সিজেন তৈরি করে আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে পৃথিবীর বাতাসের ভারসাম্য ঠিক রাখে তা আমরা অনেকেই মনে করি না। এছাড়াও গাছ আমাদের ঘূর্ণিঝড়, সিডর ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে। সেজন্য আমাদের সবার উচিৎ বৃক্ষরোপন করা।

## গাছ কাটা উচিত নয় কেন?

আমরা শ্বাসকার্যে অক্সিজেন গ্রহণ করি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে বাতাসকে যেভাবে দূষিত করি, উদ্ভিদ তেমনি বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ আর অক্সিজেন ত্যাগ করে বাতাসকে আবার বিশুদ্ধ করে তোলে। কিন্তু আমরা যদি এক এক করে গাছ কেটে ফেলি, তাহলে বাতাস আর আগের মতো নির্মল ও বিশুদ্ধ থাকবে না। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে, বাতাস হবে দূষিত। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই আমরা গাছ না কেটে বরং প্রতিদিন গাছ লাগাই।

## চাষের জমিতে সারবেঁধে গাছ লাগানো হয় কেন?

চাষীরা যখন জমিতে গাছ লাগায়, তখন অনেক চাষীই সারবেঁধে গাছ লাগায়। এভাবে গাছ লাগানোর ফলে সবগুলো গাছের মধ্যে ঠিকমতো দূরত্ব বজায় থাকে। ফলে গাছ পুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় নিজের নিজের খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু চারাগুলো যদি কাছাকাছি থাকতো তাহলে নিজের নিজের খাদ্যের জন্য তাদের মধ্যে লড়াই চলতো। ফলে কোনো গাছই ঠিকমতো খাদ্য তৈরি করতে পারত না। তারা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ত। তাছাড়া সমান দূরে থাকলে সব গাছই সূর্যের আলো পায় সমানভাবে। ফলে গাছ ভালোভাবে খাদ্য তৈরি করে দ্রুত বৃদ্ধি পাই।

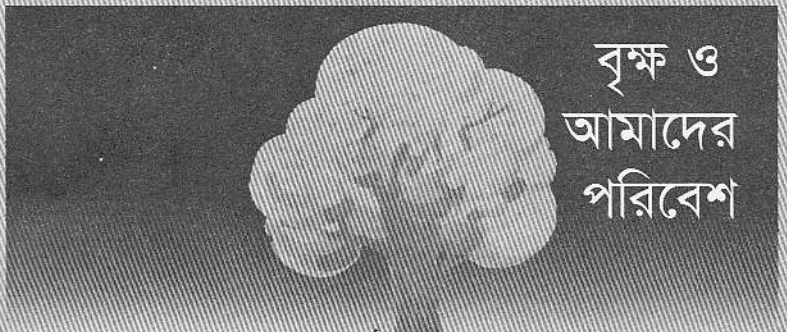

# বৃক্ষ ও আমাদের পরিবেশ

## বড় গাছের নিচে গরমের সময় ঠাণ্ডা কেন?

গাছের পাতা খাদ্য তৈরি করে। খাদ্য তৈরি করার সময় পানির দরকার। গাছ পানি টানে মূল দিয়ে। বড় গাছের পাতায় অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে অতিরিক্ত পানি বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসে। তাতে বাতাসে পানির কনা বা আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ে। ফলে ওখানকার বাতাসের তাপমাত্রা কমে যায়। বড় গাছে যেহেতু পাতার পরিমাণ বেশি। ফলে যতটা জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসে, তার পরিমাণ কম নয়। সেই জলীয় বাষ্পে গাছ ঠাণ্ডা হয়। তাছাড়া বড় বড় গাছের পাতা গাছের তলায় যে ছায়া তৈরি করে, সেই ছায়াও মাথার উপরে ছাতার মতো কাজ করে। এ জন্য বড় গাছের তলায় গরমের সময় ঠাণ্ডা।

## পরিবেশ কাকে বলে?

আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি, তাই নিয়ে গড়ে ওঠে আমাদের পরিবেশ। যেমন একটা গ্রামে থাকে ছোট ছোট অনেক বাড়িঘর, গাছপালা, রাস্তাঘাট। রাস্তার উপর আছে পুল বা সেতু। এছাড়াও গ্রামে আছে পুকুর, খাল ও বিল। আছে নানাধরনের গাছপালা। গাছপালার সাথে সাথে আছে নানা ধরনের জীবজন্তুও। যেমন-গরু, ছাগল, কুকুর বেড়াল, পাখি, ও নানা ধরনের কীটপতঙ্গ। চোখে পড়ে রঙিন প্রজাপতিও। এছাড়াও উপরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে, আকাশ, বাতাস, আলো, মেঘ ও বৃষ্টি। এসব নিয়েই আমাদের পরিবেশ।

আবার একটা শহরে থাকে চারপাশে গাড়ি-ঘোড়া, রাস্তাঘাট, বড় বড় দালানকোঠা। এছাড়াও কলকারখানার ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে যায়। বড় রাস্তায় ট্রাক, বাস, ও প্রাইভেট কার অনেক ধোঁয়া ছাড়ে। শহরের মানুষ তার চারপাশের এমন এক পরিবেশের মধ্যেই দিন কাটায়। এটাই হচ্ছে শহরের পরিবেশ। গাছপালা, পশুপাখি, আলো-বাতাস যেমন আমাদের অনেক কিছু দেয়, তেমনি আমরাও কিছুটা যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে পরিবেশকে সুন্দর করে রাখতে পারি। কিন্তু পরিবেশকে সুন্দর না রেখে আমরা অনেক সময় তাকে দূষিত করে ফেলি।

# পরিবেশ দূষণ

## বায়ুদূষণ কাকে বলে?

বাতাসের অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড-সহ সব উপাদানই একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকা উচিত। কিন্তু নানা কারণে এগুলো পরিমাণে কম-বেশি যখন হয় তখন আমাদের শরীরের পক্ষে তা ক্ষতিকর। তখন আমরা তাকে বলি বায়ু দূষণ। নানা কারণে বায়ু দূষিত হয়। যেমন-শহরে যানবাহনের ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি বাতাসে মিশে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। তখন বাতাস দূষিত হয়। সে বাতাস আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তখন শ্বাসকষ্ট-সহ নানা ধরনের অসুখ হয় আমাদের। এছাড়াও বাতাসে সূক্ষ্ম ধূলিকণা, কলকারখানার ধোঁয়ায় লোহার গুঁড়ো, আর নানা ধরনের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ভেসে বেড়ায়। এরা সবাই আমাদের বাতাসকে দূষিত করে।

## পানিদূষণ কাকে বলে? মাটি-দূষণ কি?

নদী-নালা, পুকুর, খাল-বিলের পানি নানা কারণে দূষিত হয়। কেউ পুকুরে কাপড় কাচে, কেউ বাসন মাজে এছাড়াও বর্ষার সময় বৃষ্টির পানির মাধ্যমে অনেক আবর্জনা পুকুরে বা নদীতে এসে পড়ে। আর নদীর পাড়ে যেসব কলকারখানা গড়ে ওঠে, তা থেকে নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ নদীতে ফেলা হয়। ফলে নদীর পানি দূষিত হয়। আমাদের বুড়িগঙ্গা নদী এখন সম্পূর্ণভাবে দূষিত। এসব দূষিত পানি আমরা পানও করি। তবে এসব দূষিত পানি পান করার চেয়ে নলকূপের পানি পান করা ভালো। যদিও এখন জমিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে নলকূপের পানিতেও আর্সেনিক দেখা দিয়েছে।

পানির মতো মাটিরও দূষণ হয়। চাষবাষের জমিতে এখন নানা ধরনের কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়। আর কলকারখানার আবর্জনা এখনও পাশের জমিতে এনে ফেলা হয় স্তূপ করে। এরাই মাটিকে দূষিত করে। মাটি দূষিত হওয়াকে বলে মাটি দূষণ। আর বৃষ্টির পানি যখন এই মাটি ধুয়ে নদীতে ও খালে-বিলে আসে তখন সেখানকার পানিও দূষিত হয়ে পড়ে।

# শব্দ দূষণ ও বাতাসের চাপ

## শব্দদূষণ কাকে বলে?

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতায় নানা শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। আবার কিছু কিছু অযাচিত শব্দ আছে যা আমাদের যন্ত্রণা দেয়। এরকম নানা অযাযিত শব্দ মিলেই শব্দদূষণ হয়।

আমাদের চারপাশে পাখির কিচির-মিচির শব্দ হয়, তা শুনতে কিন্তু আমাদের ভালো লাগে। বৃষ্টির শব্দ, গাছের পাতা ওড়ার শব্দ আমাদের মনকে দোলা দেয়। কিন্তু কানের কাছে বোমা-পটকার শব্দ, মাইকের শব্দ, বাসের ইলেকট্রিক হর্ন, ইঞ্জিনের হুইসেল ইত্যাদি অসহ্য লাগে। এছাড়াও আজকাল প্রতি ঘরে ঘরে উচ্চশব্দে ক্যাসেট প্লেয়ার ও টেলিভিশন চালানো হয়। কিন্তু তারা ভাবে না যে পাশের ঘরে বা বাড়িতে একজন অসুস্থ লোক থাকতে পারে। এ সবই শব্দ দূষণ। শব্দ দূষণের ফলে আমাদের মাথা ব্যথা হয়, পড়াশোনার ক্ষতি হয়।

## বাতাসের চাপ কি?

বাতাস শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়, তা আমরা প্রায় দেখে থাকি। ছেঁড়া কাগজ, খড়কুটো, ধুলোবালি ঝড়ের সময় উড়ে যায়। আমাদের চোখে মুখে পড়ে। আসলে ঝড়ের সময় আমাদের চারপাশের বাতাস ছুটে এসে আমাদের উপরে চাপ দেয়। ফোলানো বেলুনের গায়ে আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে বেলুন ফেটে যায়। মাখা আটার পিণ্ডে জোরে চাপ দিলে আটা চ্যাপটা হয়ে যায়। সেরকম বাতাসও আমাদের চারপাশ থেকে চাপ দেয়। যখন ঝড় ওঠেনি তখন গাছের পাতা স্থির, কিন্তু তখনও বাতাসের একটা চাপ আছে। তবে সে চাপ তখন তেমনভাবে বোঝা যায় না।

# বাতাস

## বাতাস সবদিকে চাপ দেয়, কিভাবে প্রমাণ করা যায়?

একটা কাচের গ্লাস পানি দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি করে নেয়া যাক। এবার একটা পোস্টকার্ড অথবা মোটা কাগজ দিয়ে পানি ভর্তি গ্লাসের পুরো মুখটা ঢেকে ফেলা যাক। এবার কার্ডের উপরে হাত রেখে আস্তে আস্তে গ্লাসটা উল্টে দিয়ে তারপর কার্ডের তলা থেকে একটু একটু করে হাত সরাতে হবে। অন্য হাত দিয়ে গ্লাসটা কিন্তু ধরে রাখতে হবে। এভার কি দেখা যাবে? কার্ডের তলা থেকে হাত সরিয়ে নিলেও গ্লাসের পানি কিন্তু কার্ড-সহ মেঝের উপর পড়ছে না। গ্লাস পানিতে ভর্তি হলেও, সামান্য একটা কার্ড ওই উল্টানো গ্লাসের মুখে লেগে থাকবে। আসলে কার্ডের নিচের বাতাস কার্ডের উপরে চাপ দিচ্ছে। আবার গ্লাস ভর্তি পানি, তা চাপ দিচ্ছে নিচের দিকে। আর পোস্টকার্ডের নিচের বাতাসের উপরের দিকে চাপ গ্লাসের মধ্যে পানির নিচের দিকে চাপের চেয়ে বেশি হওয়ায় পোস্টকার্ড ঠেলে পানি পড়ে যাচ্ছে না। এ থেকে বোঝা যায় বাতাসের চাপ আছে।

## বাতাসে উল্টোদিকে খোলা ছাতা নিয়ে হাঁটা যায় না কেন?

ছাতা মাথায় যেদিক থেকে বাতাস বইছে সেদিকে হাঁটা কষ্টকর। যেদিক থেকে বৃষ্টি আসছে, সেদিকে হাঁটা মানে বাতাসের উল্টোদিকে হাঁটা। কিন্তু খোলা ছাতা মাথায় নিয়ে বাতাসের উল্টো দিকে হাঁটা সম্ভব নয়। খোলা ছাতার উপর বাতাস বল প্রয়োগ করে। ওই বলের বিরুদ্ধে আমাদের হাঁটতে অসুবিধা হয়। কিন্তু যে দিকে বাতাস বইছে সেদিকে হাঁটলে বাতাস আর বাধা দেবে না। বরং সে ছাতাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ছাতাটাকে যদি শক্ত করে ধরে রাখা যায় তাহলে মানুষ-সহ উড়িয়ে নিয়ে যাবে। বাতাসের বল এতটাই!

# বাতাসের আরও কিছু পরীক্ষা

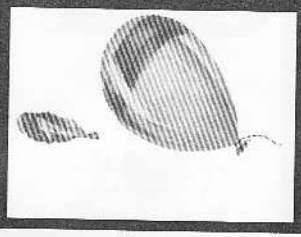

## বেলুন ফুলিয়ে মুখ বেঁধে রাখতে হয় কেন?

বেলুন ফোলানোর সময় ফুঁয়ের সাহায্যে বেশি চাপ দিয়ে বাতাস ঢোকানো হয় বেলুনে। তখন বেলুনের ভেতরের বাতাসের চাপ বাইরের বাতাসের চাপের চেয়ে বেশি। সেজন্য ফোলানো বেলুনের মুখ খুলে দিলে বেলুনের ভেতরের বেশি চাপ বাইরের বাতাসের সমান চাপে চলে আসতে চায়। তাই বেলুনের মুখ বন্ধ করে না রাখলে বাতাস বেরিয়ে আসবে।

## বাতাস ভর্তি কাগজের ঠোঙায় জোরে হাত দিয়ে চাপ দিলে শব্দ হয় কেন?

একটা কাগজের ঠোঙা ফুঁ দিয়ে ফোলানো যাক। এবার ফোলানো ঠোঙ্গাটার মুখটা বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে এনে চেপে ধরা যাক। আর ডান হাত ঠোঙার উপরে জোরে চাপ দিলে ঠোঙাটা ফেটে যাবে আর জোরে একটা শব্দ হবে।

শব্দ সৃষ্টির জন্য কোনো বস্তুর কম্পনের দরকার। মুঠোয় ধরা ফোলানো ঠোঙাতে হঠাৎ চাপ দেওয়াতে বাতাসের সঙ্কোচন হয় আবার হাত সরালে বাতাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে চায়। ফলে বাতাসে প্রবলভাবে কাঁপন লাগে। আর কাঁপনের জন্যই শব্দ হয়।

## পালতোলা নৌকা কিসের জোরে চলে?

নৌকার উপর পাল তুলে দিলে নৌকা তরতর করে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। বাতাস যখন জোরে বয়, তখন বাতাসের দারুণ শক্তি। সেই শক্তিতে ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ে, গাছ ভেঙে পড়ে, টিনের চালা উড়ে যায়। এ হল বাতাসের শক্তি। নৌকায় যখন পাল তোলা হয়, তখন সেই পালে এসে হাওয়া লাগে। নৌকা যেদিকে যাবে, বাতাস যদি সেদিকে বইতে থাকে, তাহলে বায়ুশক্তি তখন সেই পালতোলা নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যায় সামনের দিকে।

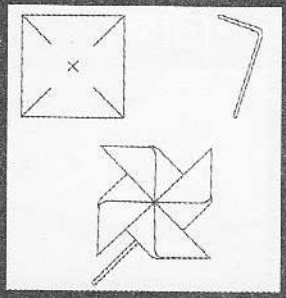

# বায়ুকল ও পানিচক্র

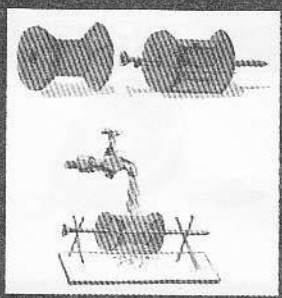

## কাগজের বায়ুকল কিভাবে তৈরি করা যায়?

একটা চারকোনা পুরু কাগজ নিয়ে সুন্দর বায়ুকল তৈরি করা যায়। কাগজের প্রত্যেকটা বাহু ১৫ সেন্টিমিটার করে নিতে হবে। তারপর উপরের ছবির মতো চারটে লাইন টেনে লাই বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে নিতে হবে। বর্গক্ষেত্রের মাঝেও একটা ছিদ্র করে নিতে হবে। এবার বর্গক্ষেত্রের মাছে ক্রস (x) চিহ্ন দেয়া কোনাগুলো ছিদ্রের উপরে মুড়ে নিয়ে এসে আঠা দিয়ে আটকে দেয়া যাক। এবার একটা তার ছবির মতো বাঁকিয়ে নিয়ে মুখটা ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অন্য মুখটা হাতে ধরে রাখলেই বায়ুকল হাওয়ায় ঘুরবে। খোলা বারান্দায় বা ছাদে গিয়ে অর্থাৎ যেখানে বাতাস আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে বায়ুকল ঘুরতে থাকবে।

## পানিচক্র কিভাবে কাজ করে?

একটা খালি সুতোর রিল ও পাঁচটি ব্লেডের টুকরো জোগাড় করে রিলটির গায়ে সমান দূরত্ব বজায় রেখে লাগিয়ে দিতে হবে। সুতোর রিলের মাঝে এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত একটি ছিদ্র থাকে। একটা লম্বা পেরেক রিলটির মাঝখানের ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া যাক। পেরেক ও রিলের ছিদ্র যেন এঁটে থাকে।

এবার কার্ডবোর্ড নিয়ে তার উপরে পানিচক্রটা বসাতে হবে। সেজন্য কার্ডবোর্ডের দু'দিকে শক্ত মোটা তার দিয়ে দুটো (x) তৈরি করতে হবে। এখন দুটো (x)-এর উপর পানিচক্রের পেরেকের দুটো প্রান্ত ঝুলবে। এবার পানিচক্র পানির কলের মুখে বসিয়ে দিলে দেখা যাবে, কিভাবে পানিচক্র ঘুরছে।

বিজ্ঞানীরা বড় বড় পানিচক্র দিয়ে অনেক কাজ করার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। বাঁধের পানি ছেড়ে প্রচণ্ড বেগে চাকা ঘোরানো যায়। আর সেই চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব। চট্টগ্রামের কাপ্তাই নদীতে বাঁধ দিয়ে এভাবে পানি বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়েছে।

# ফুটবলা খেলতে কোন্ বল বা শক্তি প্রয়োজন?

## ভারি ট্রাঙ্কের নিচে গোল কাঠের টুকরো দিলে ট্রাঙ্কটি সহজে সরানো যায় কেন?

একটা ভারি ট্রাঙ্ক টেনে বা ঠেলে সরানো সহজ নয়। কিন্তু ওই ট্রাঙ্কের নিচে যদি কয়েকটা গোল লোহার বা কাঠের টুকরো রাখা যায়, তাহলে দেখা যাবে খুব সহজেই সরানো যাচ্ছে। আসল কথা, স্বাভাবিক অবস্থায় ট্রাঙ্কের তলা ঘরের মেঝের সাথে ঠেকে থাকে। ফলে ট্রাঙ্কটাকে যখন সরানোর চেষ্টা করা হয়, তখন মেঝের সঙ্গে ট্রাঙ্কের ঘষা লাগে, ট্রাঙ্কটা বাধা পায়। যে বল এই বাধার সৃষ্টি করে, তাকে আমরা বলি ঘর্ষণজনিত বল। লোহার বা কাঠের টুকরো ট্রাঙ্কটার তলদেশকে মেঝে থেকে উপরে তুলে রাখে। ফলে ট্রাঙ্কের তলদেশ আর ঘরের মেঝের মধ্যে ঘর্ষণ কমে যায়। এভাবে সহজেই ট্রাঙ্কটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়।

## ঘোড়াগাড়ি, ঠেলাগাড়ি, রিকসা সহজে চলে কেন?

ঘোড়াগাড়ি, ঠেলাগাড়ি, রিকসা সব গাড়িতেই চাকা আছে। চাকা একটা যন্ত্র। এটা কোনো বস্তুকে ঠেলে বা টেনে চালানোর কাজে সুবিধা করে দেয়। চাকা গাড়িটার দেহকে মাটি থেকে উপরে তুলে রাখে। ফলে যখন চাকা গড়িয়ে চলে তখন ঘর্ষণ কমে যায়। এভাবে সহজে ঘোড়াগাড়ি, ঠেলাগাড়ি, রিকসা সহজে চলে।

## ফুটবল খেলতে কোন বল বা শক্তি দরকার?

ফুটবল খেলার সময় পায়ের মাংসপেশির বলের বেশি প্রয়োজন হয়। ফুটবলের সঙ্গে আমাদের পায়ের যোগাযোগ। সেজন্য পায়ের মাংসপেশির বল আমাদের ফুটবল খেলতে সাহায্য করে। তবে পা চালিয়ে আমরা সবাই যে ফুঠবলকে সমান দূরে পাঠাতে পারি, তা নয়। কেউ কিক করছি জোরে, কেউ আস্তে। যারা বলকে দূরে পাঠায়, তারা পায়ের মাংসপেশির বল বেশি জোরে কাজে লাগায়।

# আগুন যেভাবে জ্বলে

## আগুন জ্বালাতে কি বাতাসের প্রয়োজন?

আগুন জ্বালাতে অক্সিজেনের প্রয়োজন আর বাতাসে থাকে সে অক্সিজেন। তাই বাতাস ছাড়া আগুন জ্বালানো সম্ভব নয়। এটা প্রমাণের জন্য একটা ফুটো-উঁচু থালা নিই। ফুটো ও উঁচু এজন্য, যাতে থালার মধ্যে কিছুটা পানি ঢাললে সে পানি থালার বাইরে বেরিয়ে না যায়। এবার একটা মোমবাতি জ্বেলে থালার মধ্যে রেখে থালায় পানি ঢেলে দিই। পানির মধ্যে মোমবাতিটি ঠিক যেন মনুমেন্টের মতো দেখায়। এবার একটা খালি কাচের গ্লাস উপুড় করে মোমবাতিটা ঢেকে দিলে দেখা যাবে মোমবাতির শিখা ক্রমশ ছোট হতে হতে শেষ পর্যন্ত নিভে যাচ্ছে। আর গ্লাসের মধ্যে কিছুটা পানি উঠে গেছে। কিন্তু মোমবাতিটা নিভে যাচ্ছে কেন? আসলে গ্লাসের মধ্যে বাতাসের যে অংশ মোবাতি জ্বলতে সাহায্য করে, তা শেষ হয়ে গেছে। আর সেই জায়গাটা দখল করে নিয়েছে পানি।

## বাতাস কিভাবে গরম হয়?

সূর্য আমাদের তাপ দেয়। সেই তাপে মাটি গরম হয়। গরমের সময় দুপুরে মাটি উত্তপ্ত হয়ে যায়। গরম মাটির ছোঁয়ায় কাছের বাতাসও গরম হয়ে ওঠে। আর গরম বাতাস হালকা বলে তা উপরের দিকে উঠে যায়। তখন চারদিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে সেই ফাঁকা জায়গাটা ভরিয়ে ফেলে। কিন্তু সেই ঠাণ্ডা বাতাসও আবার গরম মাটির ছোঁয়ায় এসে গরম আর সেই সঙ্গে হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে চারপাশ থেকে আবার ঠাণ্ডা বাতাস এসে খালি জায়গা দখল করে নেয়। বাতাসের ওই ওঠা-নামা সমানে চলতে থাকে। এভাবে একটু একটু করে চারপাশের বাতাস গরম হয়ে ওঠে।

# ঝড় ও বৃষ্টি

## ঝড় কেন হয়?

যখন চারপাশের বাতাস ছুটে আসে, গাছে গাছে সংঘর্ষ হয়, ক্ষেতের ধান মাটিতে শুয়ে পড়ে, রাস্তাঘাটে ধুলোবালি উড়তে থাকে তখন আমরা তাকে ঝড় বলি। সূর্যের তাপে কোনো অঞ্চলের বাতাস খুব গরম হয়ে গেলে তা হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। তখন সেই ফাঁকা জায়গাটা দখল করার জন্য চারপাশের ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে আসতে থাকে। বাতাস খুব জোরে ছুটে আসে বলেই সেখানে ঝড় হয়। ঝড় হলে মাটির ঘর, বাড়ির চাল উড়ে যায়, বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ে। তখন আমরা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিই।

## পানির উৎস কি কি?

আকাশে যখন কালো মেঘ জমে তখন বোঝা যায় বৃষ্টি নামবে। আর কখনো কখনো এমন বৃষ্টি নামে যে পথ-ঘাট, পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, নদী-নালা সব পানিতে থৈ থৈ করে।

এছাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণা নামে। সেই ঝরণা থেকে নদীর সৃষ্টি হয়। পাহাড়ে বরফ জমে থাকে। বরফ গলে পানি হয়। সেই পানি ঢালু পথে নেমে এসে নদীর সৃষ্টি করে।

আর মাটির নিচ থেকেও পানি পাওয়া যায়। মাটির উপরের বৃষ্টির পানি মাটির নিচের বালি, শিলার ছোট ছোট ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে কোথাও গিয়ে জমা হয়। নলকূপ বসিয়ে লম্বা পাইপের সাহায্যে আমরা মাটির নিচ থেকে পানি পাই।

## মেঘ ও বৃষ্টি হয় কেমন করে?

সাগর, নদী, খাল-বিল ও পুকুরে পানি আছে। সূর্যের আলোয় সেই পানি গরম হয়ে বাষ্প হয়। এ বাষ্পই জলীয় বাষ্প। গরমের দিনে সূর্যের তাপ খুব বেশি থাকে। সব জলাশয়ের পানি কমে আসে। তখন পানি তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়। ওই বাষ্প আবার ঠাণ্ডা হয়ে মেঘ হয়। মেঘে জলীয় বাষ্প ছাড়াও আছে অনেক ধূলিকণা। হাওয়ার টানে সে মেঘ ভেসে বেড়ায়। তারপর শীতল হাওয়ার ছোঁয়া লেগে সেই জলীয় বাষ্প খুব ঠাণ্ডা হয়ে ছোট ছোট পানির কণায় পরিণত হয়। সেই সব পানির কণা মিশে এক একটা বৃষ্টির ফোঁটা সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির ফোঁটা ভারি হয়ে এলে মেঘ আর তাকে ধরে রাখতে পারে না। তখন তা বৃষ্টির ধারায় মাটিতে নেমে আসে। আর এভাবেই মেঘ ও বৃষ্টি হয়।

## বন্যা কেন হয়?

প্রতি বছর বর্ষাকালে কোথাও-না-কোথাও বন্যা দেখা দেয়। কখনো উত্তরাঞ্চলে কখনওবা ঢাকা শহরে বন্যা হয়। বন্যার সময় মানুষ ও গৃহপালিত পশু-পাখির কষ্টের সীমা থাকে না। বন্যার ফলে নষ্ট হয় প্রচুর ফসলও। কোনো নদীতে সারা বছর এক রকম পানির প্রবাহ থাকে না। নদীতে কখনো পানি বাড়ে, কখনো কমে। নদীতে পানি ধরে রাখার ক্ষমতা যত, তার চেয়ে বেশি পানি এলে তবেই স্বাভাবিক নিয়মে বন্যা হয়। তবে বন্যা কেমন হবে, তা নির্ভর করে কতটা বৃষ্টি হচ্ছে, ভূমির ঢাল আর গাছপালার উপরে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে আমাদের দেশের নদীর নাব্যতা কমে গেছে এ জন্য নদীগুলো বেশি পানি ধরে রাখতে পারে না। ফলে আমাদের দেশে প্রতি বছরই বন্যা হয়।

# সূর্যের আলো ও রংধনু

## সূর্যের আলো কি দেখা যায়?

সূর্য ওঠার সঙ্গে রাতের অন্ধকার কেটে ভোরের আলো ফুটে ওঠে। সূর্য আমাদের আলো দেয় বলেই চারপাশে আলো ফুটে ওঠে। সূর্যের আলোর রং কেমন? লাল, নীল, হলুদ, সবুজ তেমন কোনো রং নেই সূর্যের। তবে সূর্যের আলো ভেঙে গেলে সাতটা রঙ পাওয়া যায়। কিন্তু সাত রঙে ভেঙে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সূর্যের আলো সাদা। আমরা সূর্যের আলোকে দেখতে পাই না। কোনো জিনিসের গায়ে আলো এসে পড়ে তা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসায় আমরা সেই জিনিসটা দেখতে পাই আর এটাই মনে হয় সূর্যের আলো। কিন্তু সূর্যের আলো আমরা দেখতে পাই না।

## রংধনু দেখা যায় কেন?

বর্ষার দিনে আকাশে রংধনু দেখা যায়। খুব বড় একটা ধনুকের মতো, যার অর্ধেকটা গোল। তারপর হঠাৎ তা মিলিয়ে যায়।

সূর্যের আলোর ভেতর সাতটা রঙ লুকিয়ে থাকে। বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল—এই সাতটা রঙ। এই সাত রঙ মিলেই সূর্যের সাদা আলো। যখন পশ্চিম আকাশে সূর্য অবস্থান করে এবং পুব আকাশে বৃষ্টি নামলো, আবার সূর্য রয়েছে পুব আকাশে বৃষ্টি নামলো পশ্চিম আকাশে, তখন সূর্যের আলো গিয়ে পড়বে বৃষ্টির পানির ওপর। হাজার বৃষ্টির কণার উপর সূর্যের আলো ঠিকরে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের আলো ভেঙে যাবে সাতটা রঙে। সেই সাতটা রঙ পরপর সাজানো। আর ওটাই রংধনু।

# পানি তাপ জলীয় বাষ্প

## পানিকে তাপ দিলে কি হয়?

চা তৈরির সময় কেটলিতে পানি গরম করা হয়। কিছুক্ষণ পর সেই পানি ফুটতে শুরু করে। কেটলির মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হয়। এই ধোঁয়াটা আর কিছু নয়–জলীয় বাষ্প। কেটলির পানি তাপ পেয়ে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অতএব পানিকে তাপ দিলে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়।

## তাপ দিলে কেটলির পানি কি সবটাই একসঙ্গে গরম হয়?

কেটলি ভর্তি পানি জ্বলন্ত চুলার উপর বসিয়ে দিলে ভেতরের সব পানি একসঙ্গে গরম হয় না। কেটলির নিচের দিকের পানি আগে গরম হতে শুরু করে। গরম হলে পানি হালকা হয়ে যায়। কিন্তু হালকা পানি নিচে থাকে না। সেজন্য কেটলির নিচের পানি আগে গরম হলে হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। তখন উপরের ভারি আর ঠাণ্ডা পানি নিচে নেমে আসে। সেই পানি আবার তাপ পেয়ে গরম হয় আর গরম হলেই হালকা হয়ে যায়। আবার সেই হালকা পানি উপরে ওঠে, উপর থেকে ঠাণ্ডা পানি নিচে নেমে যায়। ফলে নিচ থেকে উপরে হালকা পানি আর উপর থেকে নিচে ভারি ঠাণ্ডা পানির ওঠা-নামা চলতে থাকে। এভাবে কেটলির সব পানি তাপ পেয়ে গরম হয়।

## জলীয় বাষ্প তাপ হারালে কি হয়?

কেটলিতে পানি ফুটছে। কেটলির মুখ দিয়ে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়া হয়ে। একটা কাসার থালা নিয়ে কেটলির মুখটাতে ধরতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাবে থালাটা। কিন্তু জলীয় বাষ্পের মুখে ধরার পরে তা আর ঠাণ্ডা থাকে না। থালার গায়ে এক এক ফোঁটা পানি দেখা যায়। কাঁসার থালা তাপ নিয়ে নিচ্ছে জলীয় বাষ্প থেকে। ফলে কাঁসার থালাটা গরম হয়ে যাচ্ছে। আবার কাঁসার থালা তাপ নিয়ে নেয়ার ফলে জলীয় বাষ্প সঙ্গে সঙ্গে তাপ হারাচ্ছে। ফলে জলীয় বাষ্প আবার পানি হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য থালার গায়ে আমরা বিন্দু বিন্দু পানি দেখতে পাই।

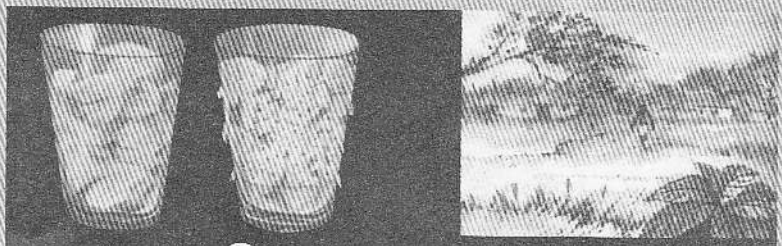

# বাতাস, জলীয় বাষ্প, কুয়াশা ও শিশির

## বাতাসে জলীয় বাষ্প আছে কিভাবে বোঝা যাবে?

আমরা বাতাস চোখে দেখতে পাই না। কিন্তু বুঝতে পারি। জলীয় বাষ্পও চোখে দেখা যায় না। কিন্তু বাতাসে কম-বেশি জলীয় বাষ্প আছে। একটা সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে খুব সহজেই বোঝা যাবে যে বাতাসে জলীয় বাষ্প আছে। একটা কাচের গ্লাসের ভেতরে কয়েক টুকরো বরফ রেখে দেয়া যাক। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে গ্লাসের বাইরে গায়ে বিন্দু বিন্দু পানি জমে আছে। পানিটা এলো কোথা থেকে? গ্লাসের ভেতরে বরফ আছে। তাই গ্লাসের পানি ঠাণ্ডা। ফলে গ্লাসের গাও ঠাণ্ডা। কিন্তু গ্লাসের চারদিকে আছে বাতাস। সেই বাতাসে জলীয় বাষ্প আছে। গ্লাসের শীতল গায়ের সংস্পর্শে আসে বাতাস। সেই শীতল সংস্পর্শে বাতাসের জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে যায় আর বিন্দু বিন্দু পানি হয়ে তা গ্লাসের বাইরের গায়ে লেগে থাকে।

## জলীয় বাষ্প ও বেলুন কেন আকাশে ওঠে?

সূর্যের তাপে পানি বাষ্প হয়ে যায়। এই বাষ্প চারপাশের বাতাসের চেয়ে হালকা হওয়ায় সহজেই উপরে উঠে আসে। অন্যদিকে বেলুন এই নিয়ম মেনে উপরে ওঠে। বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা থাকে। এই গ্যাসটাও বাতাসের চেয়ে হালকা। সেজন্য বেলুনও উঠে যায় আকাশে।

## কুয়াশা ও শিশির কাকে বলে?

শীতকালে অনেক সময় আমরা ঘন কুয়াশা দেখতে পাই। এই কুয়াশা হলো জলীয় বাষ্পের একটা পাতলা আস্তরণ।

শীতের দিনে দেখা যায়, ভোরবেলায় ঘাসের উপরে শিশিরবিন্দু চকচক করছে। এসব শিশিরবিন্দু এল কোথা থেকে? শীতের রাতে মাটি যখন খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখন সেই ঠাণ্ডা মাটির সংস্পর্শে এসে বাতাসের জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় জমে ছোট ছোট শিশিরকণায় পরিণত হয়। বাতাসের এই জলীয় বাষ্পেরই আরেক রূপ শিশির।

# রেললাইনের জোড়ার মুখে ফাঁকা রাখা হয় কেন?

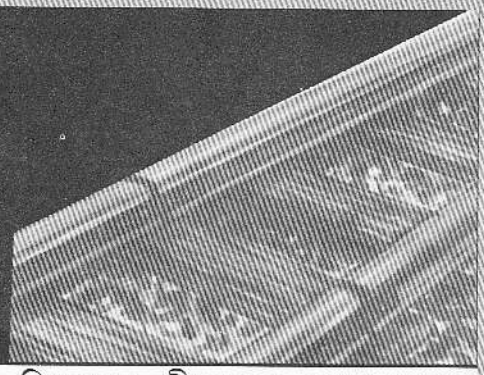

ভেজা কাপড় শুকায় কিভাবে? শীতকালে জামা-কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায় কেন?

ছাদের তারে, বারান্দার রেলিং-এ ভিজে কাপড় মেলে দিলে সেই ভিজে কাপড় আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। তখন আর তাতে পানি থাকে না। ভিজে কাপড়ের পানি সূর্যের তাপে তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়। আর ভিজে কাপড় শুকিয়ে যায়। অন্যদিকে জামা-কাপড় শীতকালে তাড়াতাড়ি শুকোয়। শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে খুব কম। তাই সূর্যের তাপে ভেজা কাপড় থেকে খুব তাড়াতাড়ি জলীয় বাষ্প বাতাসে মিশে যায়। ফলে শীতকালে ভিজে জামা-কাপড় তাড়াতাড়ি শুকোয়।

ভিজে কাপড়ে শ্লেট মোছার পরে শ্লেটের পানি শুকিয়ে যায় কেন?

শ্লেটে লেখার পর ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে দেয়া হয়। শ্লেট মোছার কিছুক্ষণ পরই শ্লেটে যে পানি লেগে থাকে তা জলীয় বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে যায়। বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকলে শ্লেট তাড়াতাড়ি শুকোয়।

রেললাইনের দুটো জোড়ার মুখে ফাঁকা রাখা হয় কেন

রেললাইনের দুটো জোড়ার মুখে ফাঁকা রাখা হয়। কিন্তু কেন? রেললাইনের উপর যখন রেলগাড়ি ছুটে চলে, তখন চাকার সঙ্গে লাইনের জোর ঘষা লাগে। চাকার ঘর্ষণে আর রোদের উত্তাপে রেললাইনের আয়তন বেড়ে যায়। এই আয়তন বেড়ে যাওয়ার জন্যে জায়গার দরকার। লাইন-দুটো বেড়ে যাওয়ার সময় জায়গা না পেলে জোড়ের মুখ-দুটো বেড়ে গিয়ে মিলেমিশে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে উপরে উঠে যাবে। পরে ঠাণ্ডা হলেও তা আর আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে না। তখন রেললাইনে গাড়ি চলার সময় একটা বিপদের আশঙ্কা থাকে। সেজন্য রেললাইনের দুটো জোড়ার মুখে একটু ফাঁকা রাখা হয়।

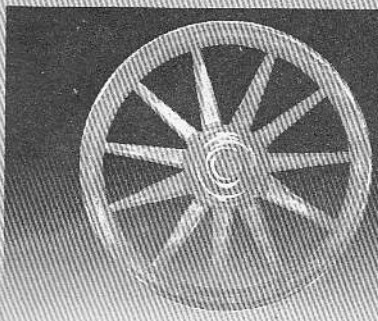

# ঘোড়াগাড়ির চাকায় লোহার বেড় পরানো হয় কেন?

## ঘোড়াগাড়ির চাকায় লোহার বেড় পরানো হয় কিভাবে এবং কেন পরানো হয়?

ঘোড়াগারি যখন চলে, তখন তার চাকাটার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় কাঠের চাকাটার উপরে একটা লোহার বেড় পরানো আছে।

প্রথমে লোহার বেড়টা চাকা থেকে সামান্য ছোট মাপে তৈরি করা হয়। তখন ওটা চাকার গায়ে কিছুতেই লাগানো যায় না। তাহলে শেষ পর্যন্ত ওটা পরানো হয় কিভাবে? আসলে চাকার গায়ে পরানোর আগে, ওই বেড়টাকে অনেকক্ষণ ধরে আগুনে গরাম করা হয়। উত্তপ্ত হলে লোহার বেড়টা আয়তনে বেড়ে যায়। আর এই অবস্থায় গরম লোহার বেড়টা চিমটে দিয়ে ধরে সহজে চাকার গায়ে পরিয়ে দেওয়া সম্ভব। লোহার বেড় এরপর ধীরে-ধীরে ঠাণ্ডা হলে আয়তনে আবার ছোট হয়ে চাকার গায়ে কামড়ে ধরে। তখন তা আর খোলা যায় না। আর এই লোহার বেড় পরানোর ফলে রাস্তায় ঘোড়াগাড়ি খুব দ্রুত চলে।

## কাঠকয়লা পোড়ালে ধোঁয়া হয় না কেনো?

কাঠ পোড়ালে ধোঁয়া বের হয় অথচ কাঠকয়লা পোড়ালে ধোঁয়া বের হয় না। যে পদার্থ পোড়ানো সম্ভব হয় তাকে দাহ্য পদার্থ বলে। সাধারণত সব দাহ্য পদার্থকেই পোড়ালে তা থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও বাষ্প উৎপন্ন হয়। আবার দেখা যায় কোনো কোনো দাহ্য পদার্থ নিঃশেষ হয়ে পোড়ে না। এর কারণ কি? কারণ হলো, যে সব পদার্থে অক্সিজেনের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম থাকে সে সব পদার্থ দাহ্য হওয়া সত্ত্বেও তা পুরোপুরি জ্বলে যায় না বা নিঃশেষ হয়ে যায় না। কাঠে থাকে সেলুলোজ তন্তু, ওয়াক্স অথবা রেজিন বা রজন। এ ছাড়াও থাকে এমন কিছু তেল, যা দাহ্য নয়। এ কারণে কাঠও সম্পূর্ণভাবে জ্বলে বাষ্প হয়ে যায় না। ফলে কাঠ পোড়ালে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কাঠকয়লা প্রকৃত অর্থেই বিশুদ্ধ কার্বন। কাঠকয়লাতে অন্য কোনো পদার্থেরও মিশ্রণ থাকে না। তাই কাঠকয়লা পোড়ালে ধোঁয়া উৎপন্ন হয় না।

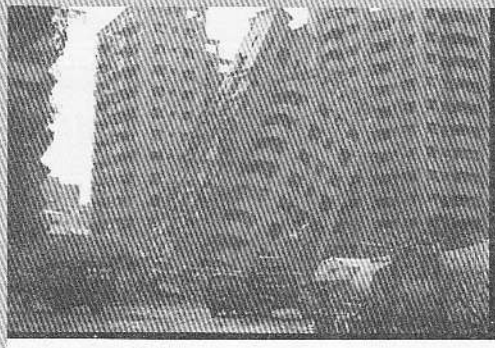

# ভূমিকম্প

## ভূমিকম্প কি?

পৃথিবীর ভেতরে সবকিছুই একটা ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। এই ভারসাম্য মাঝে মাঝে নষ্ট হয়। তখন এক একটা বিরাট অঞ্চল কেঁপে ওঠে। আর সেটাই হচ্ছে ভূমিকম্প।

## ভূমিকম্প কেন হয়?

ভূমিকম্পের চারটি কারণের কথা বলা হয়ে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে ভূমিকম্প হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকেও ভূমিকম্প হয়ে থাকে। আবার ভূগর্ভে যে সব শিলাস্তর আছে, তাতে কোথাও ফাটল ধরার ফলে শেষ পর্যন্ত ভূমিকম্প হতে পারে। এখন মনে করা হয়, প্লেট-টেকটনিক্স-এর জন্য ভূমিকম্প হয়। এ ব্যাপারটি অতি আধুনিক মতবাদ। পৃথিবী বড় বড় বারোটি পাত দিয়ে দিয়ে তৈরি। কোনো জায়গায় এরা স্থির নেই। সব পাতগুলোই আস্তে আস্তে চলছে। এদের গতিবেগ বছরে মাত্র ২ থেকে ৫. সে.মি.। একটা পাতের সঙ্গে যখন আর একটা পাতের ধাক্কা লাগে তখনই ঘটে ভূমিকম্প।

ভূমিকম্পকে একটা প্রাকৃতিক ওলট-পালট বলা চলে। ১৯৩৪ সালে বিহারে যে ভূমিকম্প হয় তাতে প্রচুর লোক মারা যায়। এছাড়াও পৃথিবীর নানাস্থানে ভূমিকম্প নিয়তই ঘটছে। ১৯৯৩ সালে ভারতের মহারাষ্ট্রের লাটুর-ওসমানাবাদে এক ভূমিকম্পে বহু মানুষ প্রাণ হারায়। তবে ভূ-বিজ্ঞানীরা এখনও আগাম ভূমিকম্পের কোনো পূর্বাভাস দিতে পারেন নি।

# মাটি

## মাটি কাকে বলে? মাটি সৃষ্টি হলো কিভাবে?

পৃথিবীর বুকের উপর যে সূক্ষ্ম আবরণ থেকে গাছপালা তার খাবার-দাবার সংগ্রহ করে, তাকে মাটি বলে। এই মাটিতেই আমরা খেলাধুলা করি, ফসল ফলায়, মাটি আমাদের খাদ্য যোগায়, বাসস্থান তৈরি করে বসবাস করি। এই মাটিতেই আমরা বড় হই। কিন্তু আমরা যে মাটি দেখি তা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এ মাটি তৈরি হয়েছে পাথর থেকে।

প্রকৃতিতে নানা রকমের খেলা চলে। কখনো ঝড় উঠছে, বৃষ্টি হচ্ছে, ভূমিকম্প হচ্ছে। ভূমিকম্প হয় নানা কারণে। পৃথিবীর ভেতরে সবকিছুই একটা ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। এই ভারসাম্য মাঝে মাঝে নষ্ট হয়। তখন এক একটা বিরাট অঞ্চল কেঁপে ওঠে। আর সেটাই হচ্ছে ভূমিকম্প।

প্রকৃতির খেলার শেষ নেই। এখানে কখনো খুব বেশি তাপ, কখনো বা খুব ঠাণ্ডা। ফলে পাথর ক্রমশ ক্ষয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে এরকম চলার পর পাথর শেষ পর্যন্ত নুড়ি, কাঁকর, বালি হয়ে যায়। তারপর গাছপালা পচেও এসে মিশছে তার সঙ্গে, মরা জীবজন্তুও আছে। সব মিলেমিশে তৈরি হচ্ছে মাটি। মাটি সাধারণ তিন প্রকার। বেলে মাটি, এঁটেল মাটি আর দোঁয়াশ মাটি।

## বেলে মাটি কাকে বলে?

বেলে মাটিতে বালির ভাগটাই বেশি, কাদা থাকে অল্প। ১০০ ভাগের মধ্যে ৯০ ভাগ বালি আর ১০ ভাগ মাত্র কাদা। আলগা মাটি বলে এতে তাল পাকানো চলে। আঙ্গুলে নিয়ে ঘষলে বালির দানা বেশ বোঝা যায়। প্রচুর পানি টানে এই মাটি কিন্তু পানি ধরে রাখতে পারে না। বেলে মাটি চাষের উপযোগী নয়।

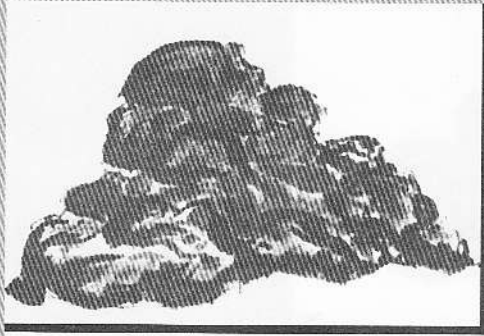

# মাটি

## এঁটেল মাটি কাকে বলে?

এঁটেল মাটি আঠালো। এতে বালি আছে, তবে বালির পরিমাণ মাত্র ১০-১২ ভাগের মতো। এই মাটির কণা খুব সূক্ষ্ম, পাউডারের মতো মসৃণ। কণাগুলির মধ্যে ফাঁক কম বলে বাতাস চলাচল করতে পারে না। পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি। পানি শুকোতেও দেরি হয়। এঁটেল মাটি দিয়ে কুমোরেরা হাঁড়ি, কলসসহ নানা ধরনের মাটির পাত্র তৈরি করে।

## দোঁয়াশ মাটি কাকে বলে?

দোঁয়াশ মাটিতে বালি আর কাদার ভাগ থাকে প্রায় সমান সমান। দোঁয়াশ মানে দো-আশলা অর্থাৎ দু'রকমের মাটি মেশানো। দোঁয়াশ মাটি বেলে আর এঁটেল মাটির মাঝামাঝি একটা অবস্থা। সেজন্যে এতে পানি শুষে নেওয়ার ক্ষমতাও মাঝারি, আর পানি ধরে রাখার ক্ষমতাও মাঝারি। এ মাটির ভেতর দিয়ে বাতাস ভালোভাবেই চলাচল করতে পারে। দোঁয়াশ মাটিতে মরা জীবজন্তুর দেহ ও পচা গাছপালার সংমিশ্রণ আছে। সে কারণে এ মাটি খুব উর্বর। চাষাবাদের জন্য দোঁয়াশ মাটি খুবই উপযুক্ত।

## মাটির উপকারিতা কি কি?

মাটি ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব। মাটিতে আমরা যেমন ফসল ফলায় তেমনি মাটি দিয়েই আমরা ঘর বাড়ি তৈরি করে বসবাস করি। আবার মৃত্যুর পর এই মাটিতেই আমাদের কবর দেয়া হয়। অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মাটি ছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই।

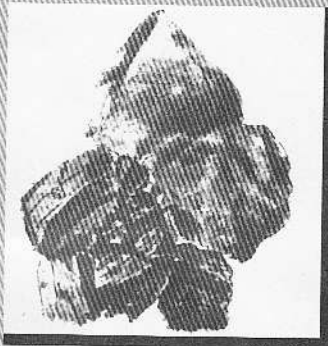

# পাথর

## পাথর কত প্রকার ও কি কি?

নানা ধরনের পাথর দেখতে পাওয়া যায়। কোনো পাথর শক্ত। কোনোটা আবার নরম। কোনোটা অমসৃণ, কোনোটা এবড়ো-খেবড়ো। আবার কোনোটা বেশ মসৃণ, শ্লেট পাথরের মতো। এসব বিভিন্ন চেহারার আর বিভিন্ন ধরনের পাথরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : আগ্নেয় পাথর, পলল পাথর, পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত পাথর।

## শ্লেটপাথর তৈরি হয় কিভাবে?

শ্লেটপাথর তৈরি হয় কাদাপাথর থেকে। বহুবছর ধরে ঝড়, বন্যা, পাহাড়ি ঢল আর তাপে ও চাপে আগ্নেয় পাথর আর পলল পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে রূপান্তরিত হয় কাদাপাথরে। আর কাদাপাথর রূপান্তিত হয় শ্লেটপাথরে।

## কাদাপাথর, চুনাপাথর আর বেলেপাথর তৈরি হয় কিভাবে?

নদীর স্রোতের সঙ্গে কাদা, বালি, ছোট-বড় পাথর সব সমুদ্রে এসে পড়ে। তারপর তা ধীরে ধীরে সমুদ্রের তলায় থিতিয়ে যায়। তখন তাকে পলি বলে। সবচেয়ে বড় পাথর সবার চেয়ে ভারি। তাই সকলের নিচে থাকে ভারি পাথর, তারপর ছোট ছোট পাথর। ছোট পাথরের উপরে বালি আর তার উপরে কাদা। এভাবে সমুদ্রের নিচে ভিন্ন ভিন্ন স্তর গঠিত হয়। পলির উপরে পলি জমার ফলে উপরের স্তরগুলির চাপে এক সময় নিচের স্তরগুলি শক্তি হয়ে পাথর হয়ে যায়। এই পাথরকেই বলে পলল পাথর। এভাবে বালি থেকে তৈরি হয় বেলেপাথর, চুন থেকে চুনাপাথর আর কাদা থেকে যে পাথর তৈরি তার নাম কাদাপাথর।

## রাস্তা তৈরিতে কোন পাথর লাগে?

শুধু রাস্তাঘাট তৈরির জন্য নয়, রেললাইন বসানো কাজেও ব্যবহৃত হয় ব্যাসল্ট নামের এক ধরনের পাথর। ব্যাসল্ট কঠিন পাথর। আগ্নেয় পাথর বা আগ্নেয় শিলা নামে এ পাথর পরিচিত। পৃথিবী একসময় জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড ছিল। কোটি কোটি বছর ধরে একটু একটু করে তাপ হারিয়ে সেই গ্যাসপিণ্ড জমে কঠিন আগ্নেয় শিলায় পরিণ হয়। আর এগুলোই হচ্ছে ব্যাসল্ট।

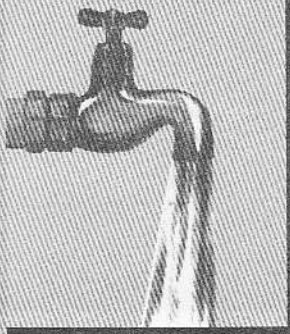

# পানি

## পানির আর এক নাম জীবন কেন?

প্রাণী বা উদ্ভিদ কেউই পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। পানি যে শুধু আমরা পান করি তা নয়, সারাদিন পানি আমাদের নানা কাজে লাগে। যা না হলে আমাদের প্রাণ বাঁচে না, তা তো আমাদের জীবনই। সেজন্য পানির আর এক নাম জীবন।

## বিশুদ্ধ পানি কাকে বলে?

যে পানি পরিষ্কার, যাতে কোনো ময়লা নেই, রোগ-জীবাণু থাকে না, সেরকম পানিকেই বিশুদ্ধ পানি বলে। পরিষ্কার আর বিশুদ্ধ পানিই আমাদের পান করার উপযোগী পানি। আর বিশুদ্ধ পানিই পান করা যায়।

## পানিতে ফিটকিরি দেয়া হয় কেন?

পুকুর বা নদীর পানি আমরা অনেক সময় পান করি। কিন্তু ময়লা আবর্জনা থাকায় পানি অপরিষ্কার থাকে। অপরিষ্কার পানিতে ফিটকিরি দিলে পানির ময়লা ভাব কেটে যায়। ফিটকিরি মিশালে পানির পাত্রের নিচে ময়লাগুলো জমা হয়। তখন উপরের পানি পরিষ্কার হয় এবং তা পান করা যায়।

## আমরা খাবার জিনিস রান্না করে খাই কেন?

আমরা শাক-সবজি, তরি-তরকারি, মাছ, মাংস ইত্যাদি রান্না করে খাই। রান্না করা খাবার সুস্বাদু হয় এবং খাবার হজম হয় তাড়াতাড়ি। তাছাড়া রান্না খাবারে খাদ্যবস্তুর মধ্যে বিদ্যমান রোগ-জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমরা খাবার রান্না করে খাই।

## দুধ কেন ফুটিয়ে খাওয়া উচিত?

দুধ সব সময় ফুটিয়ে খাওয়া উচিত। কারণ কাঁচা দুধে অনেক রকমের জীবাণু থাকে। সে গ্রামের গরু থেকে সরাসরি দোয়া দুধ হোক আর বাজারে প্যাকেটজাত দুধই হোক সবসময় ফুটিয়ে খাওয়া উচিত। দুধ ভালো করে ফুটালে জীবাণুমুক্ত হয়। আর জীবাণুমুক্ত দুধ নিশ্চিন্তে খাওয়া যায়।

# সুস্থ থাকার জন্য কী করা উচিত?

## মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া কি উচিত?

নাক শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করে। অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। কিন্তু অনেক সময় নাকের পরিবর্তে হাঁ করে আমরা মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাই। নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বাতাসের ভেতর যেসব ধুলোবালি থাকে তা নাকের ভেতরে থাকা রোম তা আটকে দেয়। কিন্তু সর্দি-কাশিতে নাক বন্ধ হয়ে গেলে তখন মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে আমরা বাধ্য হই। ফলে ধুলোবালি-সহ সমস্ত বাতাসই শরীরে ঢোকে। ফলে বিশুদ্ধ বাতাসের অভাবে শরীরে রোগ-ব্যাধি হতে পারে। তাই মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া ঠিক নয়।

## পড়াশোনা বা কম্পিউটার চালানোর সময় সোজা হয়ে বসা উচিত কেন?

পড়াশোনা করার সময় কিংবা কম্পিউটার চালানো কিংবা দীর্ঘসময় ধরে বসে কাজ করার সময় শিরদাঁড়া সোজা রেখে বসা উচিত। তাতে শরীরে ভালোভাবে রক্ত চলাচল করতে পারে। কেউ কেউ বিছানায় শুয়ে গা এলিয়ে বই পড়ে। এভাবে বই পড়াও কখনো উচিত নয়। কুঁজো হয়ে বসলে বা ঘাড় নুইয়ে বসে পড়াশোনা করা কিংবা কোনো কাজ করলে মেরুদণ্ডে কিংবা ঘাড়ে অসুখ হতে পারে।

## সর্দি-কাশির সময় মুখে হাত দিয়ে কাশা উচিত কেন?

ঠাণ্ডা লাগলে সর্দি-কাশি হলে নাক দিয়ে পানি পড়ে। বার বার হাঁচি হয়। তখন পরিষ্কার রুমালে নাক মুছতে হয়। কাশি পেলে নাক, মুখ ঢেকে কাশা উচিত। কাশার সময় মুখের থুতু যেন চারদিকে ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। সর্দি-কাশি ছোঁয়াচে রোগ। সাবধানে না থাকলে রোগ-জীবাণু একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। সে জন্য সর্দি-কাশির সময় মুখে হাত বা রুমাল দিয়ে কাশা উচিত।

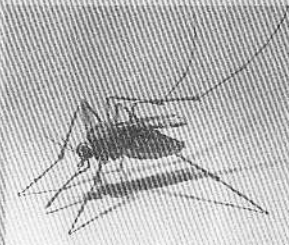

# মশা ও ম্যালেরিয়া

## মশা কি কি রোগ ছড়ায়?

মশা ছোট্ট একটা পতঙ্গ, কিন্তু মানুষের শরীরে সে নানা রোগ ছড়ায়। ম্যালেরিয়া রোগের কথা আমরা অনেকেই জানি। এই রোগ মশার কারণেই হয়। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ায় বহু লোক মারা যেত এক সময়। আজও অনেকে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশা আমাদের শরীরে কামড়ালে ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। তাছাড়া বর্তমানে এডিস মশা কামড়ে মারাত্মক ডেঙ্গুজ্বর ছড়ায়। আর এনকেফেলাইটিসের মতো মারাত্মক রোগও মশার কারণে হয়।

## ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীদের জ্বর কেঁপে কেঁপে আসে কেন?

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসতে দেখা যায়। প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি, প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম ও প্লাসমোডিয়াম ওভেল মূলত ম্যালেরিয়া হওয়ার জন্য দায়ী। এগুলো এক ধরনের আদ্যপ্রাণী। যা আমাদের রক্তের লোহিত কণিকার সঙ্গে মিশে বংশ বৃদ্ধি করে। ফলে আমরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হই। চার ধরনের প্লাসমোডিয়াম আদ্যপ্রাণী রক্তের লোহিত কণিকায় মিশে বংশ বৃদ্ধি করার পর এক সময় লোহিত কণিকা ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে। তখন প্রাণিদেহে, বিশেষ করে মানব দেহে এক ধরনের কম্পনের সৃষ্টি হয়।

## মশারা অন্ধকারে কামড় বসাবার জন্য মানুষকে খুঁজে পায় কিভাবে?

প্রতিটি প্রাণীর মতো মানুষের শরীরেও এক ধরনের গন্ধ রয়েছে। কুট করে কামড় বসিয়ে দেয়ার জন্য মশারা তাদের চোখের ওপর ভরসা না করে শুঁড় বা অ্যান্টেনার ওপর ভরসা করে। শুঁড়ের সাহায্যে মানুষের অনাবৃত চামড়ার গন্ধ সনাক্ত করে কামড় বসিয়ে দেয়। আর এই গন্ধ চেনার কাজটি করে তারা এক ধরনের কেমিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে, যা হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। আমাদের বিপাকক্রিয়া চলার মাধ্যমে শরীরে যে গন্ধের সৃষ্টি হয়, তাই বাতাসে ভেসে বেড়ায় আর তা মশাদের আকৃষ্ট করে। মশারা ক্ষুদ্র পতঙ্গ হলেও ওদের অনুভূতি ক্ষমতা এতোই প্রখর যে, ঘোর অন্ধকারেও ওরা শিকারের অবস্থান ঠিকই বুঝতে পারে।

সর্পগন্ধা

# ঔষধী গাছ

বাসক

## সর্পগন্ধা কি জাতীয় গাছ?

সর্পগন্ধা মাঝারি আকারের গুল্ম-জাতীয় গাছ। এটি আমাদের দেশের গ্রাম এলাকায় পাওয়া যায়। সর্পগন্ধা ৩০ সেন্টিমিটার থেকে প্রায় ১ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা বেশ বড়, রোম নেই, আট থেকে কুড়ি সেন্টিমিটারের মতো লম্বা। এর কাণ্ডের একটি গাঁট থেকে তিন-চারটি পাতা বেরোয়। সর্পগন্ধার অনেক গুণ। আমাদের শরীরের নানা অসুখে এটি কাজে লাগে। এই গাছের সবচেয়ে দরকারি অংশ শিকড়।

## বাসক গাছ কেমন গাছ?

বাসক গাছ গ্রামের সবাই চেনে। অনেকে যত্ন করে এ গাছ বাগানে লাগায়। লম্বা, অনেক শাখা-প্রশাখা নিয়ে এটি একটি গুল্মজাতীয় গাছ। চওড়া, বড় পাতা। রঙ গাঢ় সবুজ। ফুলগুলো ছোট, সাদা রঙের, তাতে লালচে ছিটে দেখা যায়। ফল আকারে ছোট, নীরস। বাসক পাতার অনেক গুণ। সর্দি-কাশি সারাতে বাসক পাতার রস খুব কাজ দেয়। বাসক পাতায় চট করে ছাতা পড়ে না। পোকা-মাকড়ও এর পাতা কাটে না। মোড়ক হিসেবে এই পাতা ব্যবহার করে নানা জাতের ফল সংরক্ষণ করা হয়।

## নয়নতারা কী জাতীয় গাছ?

নয়নতারা ছোট গাছ, সবাই চিনি। একে গুল্মও বলা চলে। বড় গাছের মতো শক্ত কাঠের গুঁড়ি নেই। ডালপালা বেরোয় একেবারে গোড়া থেকে। পাতা মাঝারি আকারের। পাতার আগাটা মোলায়েম, কিনারা কাটা নয়। ফুল ফোটে প্রায় সব ঋতুতেই। ফাঁপা নলের মতো একটা ডাঁটা আর পাঁচটা পাপড়ি থাকে ফুলে। ফলগুলো শুঁটির মতো। এ গাছের পাতা, ডালপালা আর শিকড় থেকে নানারকম রোগের ওষুধ তৈরি হয়।

## ছাতিম গাছ কী জাতীয় গাছ?

ছাতিম মাঝারি আকারের গাছ। ২৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। ছাতিমের পাতা পুরু, ঝকঝকে সবুজ, আকারের। ফুল ফোটে গরমের শেষে। অনেক দূর থেকে ছাতিমের গন্ধ পাওয়া যায়। এ গাছের ছাল দিয়ে নানা ধরনের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

# চেনা পাখি জানা পাখি

দোয়েল

কাঠঠোকরা

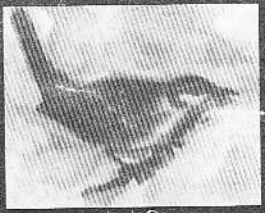
টুনটুনি

বাবুই

## দোয়েল পাখি দেখতে কেমন?

দোয়েল ছোট পাখি, কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর। দোয়েলের গায়ের সাদা-কালো পালকগুলো চোখে পড়ে। চালচলনও দেখার মতো। দোয়েলের গলার স্বরটা মিষ্টি। বসন্তকালে এরা শিস দিয়ে গান করে। দোয়েল আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। সে কারণে দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি।

## কাঠঠোকরা পাখি চেনা যাবে কিভাবে?

কাঠঠোকরা পাখি গাছে নখ আটকে ঠোকর মারে, গাছের গুঁড়ি ঠুকরে ঠুকরে পোকা-মাকড় বের করে খায়। সে জন্যে এদের আরেক নাম 'কাঠুরে পাখি'। কাঠঠোকরার মাথায় ঝুঁটি থাকে। এদের ঠোঁট খুব লম্বা আর পায়ের নখ বেশ ধারালো। গায়ের রঙ সোনালি, তার উপরে বাদামি আঁশের মতো দাগ, পেটের দিকটা লালচে।

## টুনটুনি পাখি দেখতে কি রকম?

টুনটুনি একটা ছোট পাখি। এদের পিঠের রঙ একটু খয়েরি, কিন্তু মাথাটা ধূসর। পেটের তলায় যে পালক আছে তা সাদাটে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ, ভাদ্র পর্যন্ত 'টুইজ' 'টুইজ' শব্দ করে বাড়ির আশেপাশের ঝোপঝাড়ে ক্রমাগত লাফালাফি করে। পাখিগুলো ছোট হলেও গলার স্বর জোরালো। টুনটুনি খুব ভালো বাসা তৈরি করতে পারে বলে এদের আরেক নাম 'দরজি পাখি'।

## বাবুই পাখি দেখতে কি রকম?

বাবুই পাখিও আকারে খুব বড় নয়। এদের গায়ের পালকের রঙ খয়েরি। বাবুই পাখির বাসা খুব সুন্দর। বাবুই পাখি এত সুন্দর করে বাসা তৈরি করে যে দেখলে অবাক হতে হয়। তাঁতি যেমন তাঁত বোনে, বাবুইয়ের বাসা তেমনি তাঁতির তাঁত বোনার মতো।

■

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট

সেকায়েপ

২০১৩ শিক্ষা বছরে পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

# সপ্তম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়